ইতিহাসের অলি গলি

জিয়াউল হক

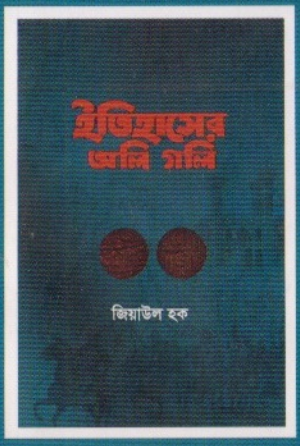

লেখকের পূর্ব প্রকাশিত বইয়ের তালিকা

১। আধুনিক যুগে ইসলামী আন্দোলন ও তার দশটি ক্ষেত্র
২। মানব সম্পদ উন্নয়নে আল কুরআন
৩। নেতা বিশ্বনেতা- শ্রেষ্ঠ নেতা
৪। বৃটেনে মুসলিম শাসক
৫। ভোট কি ও কেন ?
৬। ইসলাম সভ্যতার শেষ ঠিকানা
৭। ধরণীর পথে পথে
৮। অন্তর মম বিকশিত করো (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ)
৯। বাংলাদেশের শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা
১০। আবার কখনো যদি
১১। টাইন নদীর ওপার থেকে
১২। নির্বাচিত কিশোর গল্প সংকলণ
১৩। কালচার নিয়ে অনাচার
১৪। বই খাতা কলম (প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ)
১৫। বিদায় বন্ধু দেখা হবে জান্নাতে
১৬। অল্প স্বল্প গল্প
১৭। এই ধরণী তলে
১৮। শিক্ষাব্যবস্থাঃ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী
১৯। চিকিৎসার আড়ালে মিশনারী তৎপরতা ও আমাদের চিকিৎসকদের দায়িত্ব
২০। ইসলামী শাসন ব্যবস্থাঃ মৌলিক দর্শন ও শর্তাবলী (মদিনা পারলিকেশন্স)

লেখক পরিচিতি

কৃষ্টি আর কুষ্টির (পাট) জন্য বিখ্যাত কুষ্টিয়ার (দৌলতপুর থানা, গ্রামঃ ফিলিপনগর) সন্তান জিয়াউল হক। জন্ম ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬০। তৎকালিন পাকিস্থান নৌবাহিনীতে কর্মরত পিতার কর্মস্থল করাচিতেই কেটেছে শৈশব, কৈশোর আর তারুণ্যের দিনগুলি। স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ এ বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন। ইংল্যান্ডের ব্রিষ্টল ইউনিভার্সিটি থেকে মেন্টাল হেলথ্, ই-এম-আই এবং ডিমেনশিয়া মেনেজমেন্টে এ্যাডাপটেশন কোর্স শেষ করে ইংল্যান্ডেরই একটি বেসরকারি মেন্টাল হাসাপাতালের ডেপুটি ম্যানেজার এবং ক্লিনিকাল লীড হিসেবে দীর্ঘদিন চাকুরি করেছেন। অবসর নিয়ে বর্তমানে ইংল্যান্ডেই স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। নাবিকের নোঙ্গর হয় ঘাটে ঘাটে। শৈশবেই খেলাচ্ছলে কলম হাতে নিয়ে লিখতে বসা নাবিক পিতার সন্তান জনাব জিয়াউল হকও জীবনের দুই তৃতীয়াংশ সময়ই দেশের বাইরে কাটিয়েছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পেরিয়ে ইংল্যান্ডে স্থায়ীভাবে অবস্থান করলেও নিয়মিত লেখালেখি করছেন। ধর্ম ও সমাজ, রাজনীতি ও আন্তর্জাতিকসহ সমসাময়িক বিষয়ে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ফিচার ও কলাম লিখার পাশাপাশি গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, উপন্যাস ও সংগীতসহ সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি অংগণেই তার উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাথেও তিনি জড়িত রয়েছেন।

ইতিহাসের অলি গলি

জিয়াউল হক

দি পাথফাইন্ডার পাবলিকেশন্স

www.pathagar.com

ইতিহাসের অলি গলি

জিয়াউল হক

■ **প্রথম প্রকাশ:**
২৩ জানুয়ারি ২০১৮ ইং

■ **প্রকাশনায়:**
দি পাথফাইন্ডার পাবলিকেশন্স
চকফরিদ, কলোনী, বগুড়া।
মোবাইল: ০১৭১১-৪৮৩৪৯৯, ০১৭৪৮-৯৪০৪১৬।
E-mail: the.pathfinder.publications@gmail.com

■ **প্রকাশক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক**
সুলতানা আখতার

■ **গ্রন্থস্বত্ব:**
লেখক কর্তৃক সম্বলিত

■ **প্রচ্ছদ:**
সাজিদুল ইসলাম সাজিদ

■ **বর্ণ বিন্যাস:**
ইসরা, বগুড়া।

■ **পরিবেশক:**
পরিলেখ
ঐশিক
আব্দুল হক সড়ক,রাণীনগর, ঘোড়ামারা, রাজশাহী

■ **মুদ্রণে:**
সূচনা সিস্টেম কম্পিউটারস্ এন্ড প্রিন্টার্স
চকযাদু ক্রসলেন, প্রেসপট্টি, বগুড়া।

■ **নির্ধারিত মূল্য: একশত আশি টাকা মাত্র।**

ITIHASHER OLI GOLI
Written by: Ziaul Haque
Published by: The Pathfinder Publications.
Phone: 01711-483499, 01748-940416
Price: Tk.180.00 Only
ISBN: 978-984-34-3517-0

www.pathagar.com

উৎসর্গ

ইংল্যান্ডে এসে পরিচয় ঘটে দুইজন ব্রিটিশ বাংলাদেশী পণ্ডিত; ডঃ আবুল কালাম আজাদ আর ডঃ আব্দুস সালাম আজাদি'র সাথে। সারা বিশ্বজুড়ে এঁরা জনপ্রিয়। আমি মহা সৌভাগ্যবান এদিক থেকে। এক অজ্ঞাত ও দূর্বোধ্য কারণ ও সেই সাথে তাঁদের মহানুভবতার বদান্যতায় এই দুই পণ্ডিত বিভিন্ন সময়ে কোন ওজর ছাড়াই তাঁদের পাশে বসতে দিয়েছেন, আপত্তি করেন নি।

গুণমুগ্ধ এক শ্রোতা হয়ে অবাক বিস্ময়ে পাশে বসে দু'জনের আলোচনা, মিষ্টি বিতর্ক ও বাদানূবাদ শুনেছি। এই দুই পণ্ডিতের ছাত্র হবার মত যোগ্যতাও আমার নেই। ইংল্যান্ডের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, কখনো বা আমার নিজের কিংবা ডঃ আজাদ বা ডঃ আজাদির বাড়িতে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেছি, শুনেছি তন্ময় হয়ে। অজ্ঞতার কোন অতলান্তে পড়ে রয়েছি, আমার জ্ঞানের দীনতা যে কত প্রগাঢ়, সেটা বুঝেছি এই জোড় মানিকের সান্নিধ্যে বসে। এটা এক বিরাট অর্জন আমার নিজের জন্য। কৃতজ্ঞতার পাশাপাশি এক সীমাহীন ঋণে বাঁধা পড়ে রয়েছি উভয়ের কাছে।

একমাত্র আল্লাহর জন্যই তাঁদের ভালোবাসি। আল্লাহ এ দু'পণ্ডিতকে বিশ্ব মানবতার কল্যাণে কবুল করে নিন। তাদের নেক হায়াত বৃদ্ধি করে দিন, আর মৃত্যু পরবর্তি জীবনেও যেন এই দুই পণ্ডিতের সাথে জান্নাতের এক কোণে একটু খাঁনি ঠাঁই দেন, সেখানেও যেন প্রিয় এই ব্যক্তিদের দেখা ও সঙ্গ পাই, সেই দোওয়া ও প্রত্যাশায় সামান্য এ কাজটুকু, আমার বিংশতিতম গ্রন্থ; **'ইতিহাসের অলি গলি'** তাদের হাতে তুলে দিয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।

জিয়াউল হক
নিউক্যাসল, ইংল্যান্ড

www.pathagar.com

লেখকের দু'টো কথা

আলহামদুলিল্লাহ। শেষ পর্যন্ত **'ইতিহাসের অলি গলি'** বইটা আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে। প্রকাশ হয়ে পাঠকের হাতে আসা বই এর তালিকায় এটা আমার একবিংশতম বই। আবারও মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আলহামদুলিল্লাহ।

ইতিহাস হলো এমন একটা বিষয়, যা নিয়ে সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিবৃত্তিক অসততা করা হয়েছে। এর বিকৃতি ঘটানো হয়েছে সবচেয়ে বেশি। বিশ্ব ইতিহাসের ধারায় আজ অব্দি কোনো একটা বিষয়ের ইতিহাস চূড়ান্ত ভাবে লেখা হয়নি। প্রতিটি 'চূড়ান্ত' ইতিহাসের পরে আবার তা পূনর্লিখনের প্রয়োজন পড়েছে। নানাবিধ কারণে জানা ইতিহাসকেই আবার নতুন করে লিখা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন রসদ যোগ করে।

তার মানে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানো হয়েছে অত্যন্ত ন্যাক্কারজনকভাবে। মানবসমাজের অনেক খলনায়ককে ঐতিহাসিকরা নায়ক বানিয়ে ছেড়েছেন নিজেদের কলমের খোঁচায়। আবার এর বিপরিতে অনেক নায়ককেও অত্যন্ত ঘৃণিত খলনায়ক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

একটি জাতি বা গোষ্ঠীকে অবদমিত করে রাখার উদ্দেশ্যে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানোর বিষয়টা একটা ভয়ানক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে যুগের পর যুগ ধরে। খুব কম ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে প্রায় প্রতিটি ঐতিহাসিকই নিজের বা নিজেদের আদর্শিক ও রাজনৈতিক বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখতে, নিজেদের অপরাধ ও ব্যর্থতাকে গোপন করতে বা কৃতকর্মকে মানবসমাজে বৈধতা দিতে ঘটিত ঘটনার ইতিহাসকে বিকৃত করেন বা তাদের দিয়ে তেমনটাই করানো হয়।

তাছাড়া ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে গিয়ে এমন অনেক খুঁটি নাটি ঘটনা, তথ্য ও উপাত্তকে 'অপ্রয়োজনীয়' বা তুচ্ছ' ভেবে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যান, যে সব তথ্য-উপাত্ত পাঠক মহলে জানা হলে উপস্থাপিত পুরো ইতিহাসকেই আবার প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলবে।

বিকৃত ইতিহাসের কারণে সমাজ ও সভ্যতায় যে ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে, বিশেষ করে, আদর্শিক, মনস্তাত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক বিচারে, তার সবকটিরই শিকার হয়েছি আমরা এই বাংলাভাষী ও বাংলাদেশি এবং বৃহত্তর অর্থে মুসলিম জনগোষ্ঠী। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, আমাদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজচিত্র।

ধৈর্য সহকারে খুঁজলে এরকম হাজার হাজার ঘটনার অস্তিত্ব পাওয়া যাবে বিশ্ব ইতিহাসে। এই গ্রন্থে এরকমই পঁচিশটা ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবিকৃতভাবে তুলে ধরা হয়েছে, সেই সাথে উক্ত ঘটনার নির্যাস থেকে আমরা কি শিক্ষা নিতে পারি আমাদের ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনের জন্য, সে বিষয়টাও তুলে ধরার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। কতটা সফল হয়েছি, সে বিষয়টা শ্রদ্ধেয় পাঠক মহলই বিচার করবেন। ভুল ত্রুটিগুলো জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো।

বইটা পাঠকের হাতে পৌছে দিতে 'দি পাথফাইন্ডার পাবলিকেশন্স' এর এমডি সুলতানা আখতার আপা নিরলস পরিশ্রম করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁকে উত্তম প্রতিদান দেবেন ইনশাআল্লাহ।

জিয়াউল হক
নিউক্যাসল, ইংল্যান্ড
জানুয়ারি, ২০১৮

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

জনাব জিয়াউল হক রচিত 'ইতিহাসের অলি গলি' বইটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ।

এটি 'দি পাথফাইন্ডার পাবলিকেশন্স' এর দ্বাদশ বই। বইটির নামের মধ্যেই রয়েছে এর তাৎপর্য।

বইটিতে অনেক অপূর্ব ইতিহাসের বর্ণনা এসেছে বটে, তবে সেইসব ইতিহাস থেকে আমরা আজকের সমাজ কি শিক্ষা ও উপদেশ নিতে পারি বা নেওয়া যেতে পারে, সেটাই হলো এই বই এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

জানা-অজানা নানা কাহিনী সম্বলিত বইটি সমৃদ্ধ পাঠকের মনে চিন্তার খোরাক জোগাবে বলে বিশ্বাস রাখি।

আপনাদের ভালোলাগা'ই আমাদের স্বার্থকতা। ভুল-ত্রুটিগুলো শুধরে দেবার আবেদন রইল।

পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাই।

সুলতানা আখতার
প্রকাশক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
দি পাথফাইন্ডার পাবলিকেশন্স, বগুড়া।
বাংলাদেশ, জানুয়ারি ২০১৮।

www.pathagar.com

সূ·চি·প·ত্র

আকলমান্দ কে লিয়ে ইশারা-হি কাফি!	০৭
আপনিই তো ইতিহাস গড়বেন!	০৯
আমরা আর সেই ভুল করবো না। প্রমিজ	১২
'কলকাঠীর কোলকাতা'	১৪
গ্রানাডার কান্না	১৯
অপেক্ষা কেবল সময়ের!!	২৪
নিরাপদ নারীত্বেই সভ্যতা নিরাপদ!	২৭
পচা পান্তায় লর্ড হেস্টিংসের ডিনার	৩০
এনাফ ইজ এনাফ, আর নয়	৩২
যে আগুন নীরবে জ্বলে	৩৫
রাজনীতি বিমুখতাই মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা!	৪০
লর্ড ক্লাইভ ও ইতিহাসের কান্না	৪২
হায় ইতিহাস! তুমি কি মুখ খুলবে না?	৪৫
হায়দ্রাবাদের কান্না ও আমাদের শিক্ষা	৪৯
প্রশ্নটা কি একটু কঠিন হয়ে গেল?	৫৪
এই একটা ক্ষেত্রেই আমাদের অনীহা বটে!	৫৮
দাম্ভিকের শির ধুলোয় লুটোয়	৬২
গাজী সালাহউদ্দীন-মানুষ সালাহউদ্দীন	৬৬
'বোম্বাইয়া'	৭৩
কপালে টিপ, সিঁথির সিঁদুর ও প্রসঙ্গকথা	৭৫
মাছির চোখ ও বই পড়া	৭৮
মজলুমের সাহায্যকারীগণ অবশ্যই পুরস্কৃত হন	৮১
ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করুন নিরাপদ থাকবেন	৮৫
জব চার্নক, মানবিক শিক্ষা ও আমাদের ধর্মবোধ	৮৯
কুরআন যদি ফ্রান্সের চেয়েও শক্তিশালী হয়, তো, আমি কি করতে পারি?	৯৩

www.pathagar.com

আকলমান্দ কে লিয়ে ইশারা-হি কাফি!

সেই ১২৯৯ সালের ২৭ জুলাই এর কথা। তুর্কি ওসমান গাজী ইতিহাসের মাহেন্দ্রক্ষণের এ দিনটিতে সেলজুকদের পরাজিত করে নিজ বংশের শাসন চালু করেন ছোট্ট এক জনপদে। তিনি কী জানতেন যে তিনি ইতিহাস গড়তে যাচ্ছেন? তিনি জানতেন না, কারণ ভবিতব্য কেউই জানে না। তিনিও জানেননি যে, তার সেদিনকার সেই শাসন ক্ষমতা একদিন ইসলামের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করবে। তার সেই শাসন ব্যবস্থাকেই তারই পরবর্তী বংশধররা একদিন পরিণত করে বিশ্বের বিস্ময়; ওসমানিয়া খেলাফত হিসেবে।

১২৯৯ থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রায় ছয়টি শতক ধরে তিল তিল করে গড়ে তোলা এই শাসনব্যবস্থা বিশ্বে ভূ-রাজনৈতিক, আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক মানচিত্রকে বদলে দিয়েছে চিরদিনের জন্য। আজকের প্রবল শক্তিধর ইউরোপের বুকে কাঁপন তুলে ওসমানিয়া খেলাফত হাঙ্গেরি আর ভিয়েনার দরজায় কড়া নেড়ে নেড়ে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিয়েছে। কাঁপিয়েছে ইউরোপের পুরো জনপদকে।

নিজেদের দোরগোড়ায় মুসলমানদের এই সরব উপস্থিতির কারণেই ইউরোপের সদা বিবদমান গ্রুপ; যারা নিজেদের মধ্যে সারা জীবন লড়ে এসেছে, সেই তারাই মুসলিম তথা ওসমানিয়া খেলাফতকে ঠেকাতে একসাথে কাজ করেছে। এ যেন বাঘ আর ছাগলকে এক ঘাটে পানি খাওয়ানের মত অবস্থা। কিন্তু সেটাই বাস্তবে ঘটেছে।

দীর্ঘ ছয়শত বৎসর ধরে গড়ে তোলা এই খেলাফতকে ভেঙে তছনছ করে দিতে ইহুদি বাবা ও মুসলিম মায়ের সন্তান কামাল পাশার সময় লেগেছিল মাত্র ছয়টি বৎসর। হ্যাঁ, ছয়টি বৎসর মাত্র! আর এই কাজটি সে করতে পেরেছিল, কারণ তার হাতে ছিল রাষ্ট্রক্ষমতা ও প্রশাসন। আরও ছিল নিষ্কর্মা মুসলিম আলেম নামধারী প্রতিপক্ষ; যারা মজহাবি ফেরকায় বিতর্ক উপভোগ করতো, যারা সরকার বা প্রশাসনের নৈকট্য পেতে ঈমান ও আকিদা বিরোধী যে কোন ফতওয়া দিতে প্রস্তুত ছিল, যারা দুনিয়ার সামান্য খুদকুঁড়োর বিনিময়ে আল্লাহর কুরআন আর রাসুল (সা:)-এর আয়াতকে নির্দ্বিধায় বিকিয়েছে। আরও ছিল মুসলমান নামধারী এক বিশাল জনগোষ্ঠী, যারা ধর্ম কর্ম নিয়ে বেশ ছিল! তবে কেবল রাজনীতিতেই ছিল উদাসীন! এমনতর অবস্থা ছিল কামাল পাশার জন্য শাপে বর!

কামাল পাশা ১৯২৩ সালে ইসলামি খেলাফতে বিলুপ্ত করে তুরস্ককে আধুনিক গণতান্ত্রিক, সেক্যুলার রাষ্ট্র ঘোষণা করার পর থেকে ১৯২৮ এর

www.pathagar.com

সালের মধ্যে এক এক করে নামাজ, পর্দা, হিজাব, ইসলামি ক্যালেন্ডার, আরবি বর্ণমালা, আরবি শিক্ষা, মাদ্রাসা, শরীয়া আদালত, ওয়াকফ বোর্ড সব কিছুই বন্ধ করে দেয়। সে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে মসজিদগুলোকে বন্ধ করে দিয়ে সেগুলোকে পানশালা, নাইট ক্লাব হিসেবে রূপান্তর করে। ইসলামি পোশাক পরা, পুরুষদের দাঁড়ি রাখা, মুসলমানি করানো সব বন্ধ করে দেয়।
এগুলো কি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকারক ছিলো? কিন্তু সে এসব ঘৃণ্য কাজগুলো নির্দ্বিধায় করে গেছে তুরস্ককে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে গড়ার উন্মাদনায়। উন্মাদনা আরও ছিল। বেতনভুক্ত, আত্মবিকৃত বুদ্ধিজীবী ও মুক্তচিন্তক নামধারী কিছু দালালকে সে মাঠে নামিয়েছিল ইসলামকে নিন্দিত ও বিতর্কিত করার মিশনে। এসব দালালরা সারা দেশ চষে বেড়িয়েছে ইসলামের বিরোধিতা করার কাজে। তুরস্কের সকল প্রচারযন্ত্র এদের কথাকে, এদের ভাষণ বিবৃতিকে ফলাও করে প্রচার করেছে, ছড়িয়ে দিয়েছে সমাজের সর্বত্র। আর এরই বিপরতিে ইসলামের পক্ষে যেসব বুদ্ধিজীবী আলেম ওলামা দু-একটা কথা বলার চেষ্টা করেছে, রাতারাতি তারা সব গুম হয়ে যেতে শুরু করেছে। খুঁজে খুঁজে এসব আলেম ওলামাকে ধরে এনে হয় বিচারের নামে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে, আর না হয় তারা চিরদিনের মতই গুম হয়ে গেছে অজানা হাতের ইশারায়।
আসলে রাষ্ট্রকে নিরাপদ করতে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এসব কর্মকাণ্ড সে করছে, এমনটা দাবি করলেও ব্যাপারটা কিন্তু কোনমতেই তেমন নয়, বরং সে এগুলো করেছিল ইসলামকে তুরস্কের মাটি হতে উৎখাত করতে। সেটাই ছিল তার জীবনের মিশন, তার সকল কর্মকাণ্ডের পেছনে আসল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে কী সমকালীন আলেম ওলামা আর আপামর তুর্কি জনতা রুখে দিতে এক যোগে নিজেদের মধ্যে মজহাবি ও গোত্রীয় বিভেদ ভুলে এগিয়ে আসতে পেরেছিল?
এর উত্তরটা অবশ্যই নেতিবাচক হতে বাধ্য। আর তাদের সেদিনকার সেই নিষ্ক্রিয়তার খেসারত কেবল তুর্কিদের একাই দিতে হয়নি, দিতে হয়েছে পুরো মুসলিম উম্মাহকে। খেসারত দেয়ার সে প্রক্রিয়া আজও একইভাবে চলছে। আজও মুসলিম উম্মাহ সেদিনকার সেই নিষ্ক্রিয়তার খেসারত দিয়ে চলেছে।
ইতিহাসের এ বাস্তবতাকে সামনে রেখে এবারে আপনার নজরটা একটাবারের জন্য আশপাশে, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিসরে বিদ্যমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক দিকে নিয়ে আসুন। কিছু বুঝতে পারছেন কি? বুদ্ধিমানদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট। কথায় আছে না- 'আকলমান্দ কে লিয়ে ইশারা-হি কাফি!'

www.pathagar.com

আপনিই তো ইতিহাস গড়বেন!

ঘটনাকাল ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহের পর, পুরো দিল্লিজুড়ে তখন অচলাবস্থা, নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি। কে যে কার বন্ধু আর কে যে দুশমন, সেটা বোঝা মুশকিল। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা দখলের মাধ্যমে ভারত দখল শুরু। মোটামুটি একটি শতক ধরে শত চড়াই উতরাই সয়েও ইংরেজরা ঠিকই এক এক করে পুরো ভারতকে, পাকিস্তান থেকে বার্মা, শ্রীলংকা থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত দখল করে নেয়। ভারতের সম্পদ চুষে এনে গড়ে তুলতে থাকে কাদা মাটির স্যাঁতস্যাঁতে ইংল্যান্ডকে।

যা হোক, ভারতের ইংরেজরা সবচেয়ে কড়া প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় পলাশীর যুদ্ধের ঠিক একশত বৎসর পরে এসে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে, সিপাহি বিদ্রোহের সময়। বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পরে ভারতে ইংরেজ সরকার পাগলা কুকুরের মত হুঁশ-জ্ঞান হারিয়ে চরম দমন-পীড়ন শুরু করে। হাজার মানুষকে বিদ্রোহে অংশ নেয়া বা সহায়তা করার অভিযোগে হত্যা করে।

ঠিক এরকম এক সময়ে অনেকের মতই পুলিশ কনস্টেবল গঙ্গাধর, নেহেরু, তার স্ত্রী ইন্দ্রানী ও দুই সন্তানসহ দিল্লি থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন নৌকা যোগে। যমুনা নদীর আশপাশে ইংরেজ সৈনিকরা নিয়মিত টহল দিচ্ছিল রাতের বেলাতেও। তারা নৌকা থামিয়ে ধরলো গঙ্গাধর, নেহেরু ও তার পরিবারকে। ইংরেজ সৈনিকদের চোখ আটকে গেল চার বৎসরের ফুট ফুটে এক শিশু কন্যার উপরে।

দিল্লিতে বিদ্রোহী সিপাহিরা অনেক ইংরেজ সৈন্য এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের হত্যা করেছে। অনেক ইংরেজ নারী, পুরুষ, শিশু নিখোঁজও ছিল। গভীর রাতে যমুনার বুকে এই ডিঙ্গি নৌকায় চারজন ভারতীয় যাত্রীর মধ্যে এক ফুটফুটে শিশুকন্যাকে দেখে তারা ধরেই নিল, এই শিশুটা কোনো ইংরেজের। তারা জেরা করতে শুরু করলে গঙ্গাধর দাবি করলেন, শিশুটি তার নিজের কন্যাশিশু।

ইংরেজদের কোনমতেই তা বিশ্বাস হচ্ছিল না, ফলে তারা প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে জেরা করতে শুরু করলো। তার জবানবন্দী নেয়া হলো, স্ত্রী ইন্দ্রানীর জবানবন্দীও নেয়া হলো, সেই সাথে তার আট বৎসরের ছেলে আর এই চার বৎসরের শিশুকন্যাটিরও জবানবন্দী নিয়ে সৈন্যরা নিশ্চিত হলো যে, আসলেই শিশুটি গঙ্গাধরেরই সন্তান। তারা ছেড়ে দিল পরিবারটিকে।

এই ঘটনার প্রায় সাড়ে তিন বৎসর পরে এই পরিবারে আরও এক পুত্র

www.pathagar.com

সন্তান জন্ম নেয়, গঙ্গাধর নাম রাখেন মতিলাল। হ্যাঁ মতিলাল নেহেরুর কথা বলছি। এই মতিলাল নেহেরুর সন্তানই হলো জওহারলাল নেহেরু, যার নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনে ভারত হাতছাড়া হয়েছে ইংরেজদের। যে পরিবার একদিন কোনোমতে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিল সেই পরিবারই সময়ের ব্যবধানে ইতিহাস গড়লো!

উমাইয়া খেলাফতের বিরুদ্ধে পরিচালিত আব্বাসীয়দের সফল বিদ্রোহ থেকে বাঁচতে কোনভাবে কেবলমাত্র নিজের প্রাণটুকু নিয়ে সস্ত্রীক পালালেন আব্দুর রহমান (আব্দুর রহমান ইবনে মুয়াবিয়া ইবনে হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান), সেই ৭৫১ সালে।

পথিমধ্যে তার ভাই ইয়াহহিয়া ধরা পড়ে নিজের মস্তক হারালেও তিনি অনেক কষ্ট সয়ে, মিশর, তিউনিশিয়া, মরক্কো এবং সবশেষে সাগর পেরিয়ে পৌঁছুলেন আন্দালুস; আজকের স্পেনে। সেটা সেই ৭৫৫ সালের ঘটনা। এর চল্লিশ বৎসর আগে তারেক বিন জিয়াদের মাধ্যমে স্পেনে মুসলিম শাসন চালু হলেও মুসলমানরা তখনও আরব ও অনারব আফ্রিকীয়দের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জড়িয়ে রয়েছে, তেমনি স্থানীয় খ্রিষ্টানরাও তখনও বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল।

একদিকে উবাইদুল্লাহ ইবনে উসমান, আব্দুল্লাহ ইবনে খালিদ ও অপরদিকে আমির ইউসুফ আল ফিহরী, এই তিনপক্ষের যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত মুসলিম স্পেন যখন টলটলায়মান, ঠিক তখনই উমাইয়া শাসনের প্রতি পূর্ব থেকেই সহানুভূতিশীল সেনাপতি উবাইদুল্লাহ ইবনে উসমান মরক্কোতে অবস্থানরত আব্দুর রহমানের কাছে সাহায্য চেয়ে দূত পাঠান। আব্দুর রহমানও এমন একটা মোক্ষম সময়ের জন্যই অপেক্ষমাণ ছিলেন। তিনি কাল বিলম্ব না করেই মাত্র ৩০০ সৈন্য নিয়ে মালাগার পূর্বপ্রান্তে নামলেন ৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দে।

সেই শুরু, তারেক বিন জিয়াদ যে মিশনের শুরু করেছিলেন, তারই সমাপ্তি টানতে, স্পেনের এই বিশাল ভূ-খণ্ডে ইসলামি শাসনব্যবস্থাকে সুসংহত করতে নেমে পড়লেন আব্দুর রহমান। ৭৭৯ সালের মধ্যে তিনি স্পেনের অবিসংবাদিত আমীর! এই তিনিই মাত্র কিছুদিন আগে কোনমতে প্রাণটা হাতে করে পালিয়ে বেঁচেছেন!

সেই একই অবস্থা হয়েছিল আর এক আব্দুর রহমানের বেলাতেও। তিনি সারাটা জীবন তিউনিসিয়া থেকে মিশর, মিশর থেকে গ্রানাডা কিংবা মরক্কোর ফেজ নগরীতে প্রাণ হাতে করে ছুটে বেড়িয়েছেন। কখনও বা মরুভূমিতে ভক্ত বেদুঈন আরবের তাঁবুতে বৎসরের পর বৎসর কাটিয়েছেন। অখণ্ড অবসরে বসে বসে লিখেছেন আল মুকাদ্দিমা। তার গভীর অন্তর্দৃষ্টি

www.pathagar.com

আর পাণ্ডিত্যের কারণে আব্দুর রহমান আল হাদারামি থেকে হয়ে উঠেছেন 'ইবনে খালদুন'! ইতিহাসের বরপুত্র।

আরও একজনের কথা বলতে পারি, যেদিন তিনি পৃথিবীতে জন্মেছিলেন, সেই দিনই তাকে প্রাণভয়ে পালাতে হয়েছিল নিজ অসুস্থ জননীর কোলে চড়ে, পাড়ি দিতে হয়েছিল দীর্ঘ পাহাড়ি পথ, দুর্গম মরু! অথচ এই শিশুসন্তানই এক সময় পরবর্তীতে হয়ে উঠেছিলেন বিশ্ববিখ্যাত বীর, কিংবদন্তি গাজী সালাহউদ্দীন।

খুঁজলে এরকম শত শত ইতিহাস রয়েছে শত শত মানুষের জীবনে। প্রায় প্রতিটি সমাজেই। যারা ইসলামের ইতিহাস জানেন, তারা জানেন প্রিয় রাসূল (সা) কেও রাতের আঁধারে মক্কা থেকে এক বস্ত্রে পালিয়ে আসতে হয়েছিল মদিনার উদ্দেশে, আল্লাহর আর এক নবী হযরত মুসা (আ)কেও প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়েছিল। এই দুই মহামনাব ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত নবী ও রাসূল। এঁদের কথা আলাদা। কিন্তু এর আগে যাদের কথা বললাম তারা ছিলেন অতি সাধারণ লোক।

পালিয়ে বাঁচা এই সব ব্যক্তিবর্গরাই একদিন ইতিহাস গড়েছেন। আজ যারা জীবনের বিভিন্ন বাঁকে মৃত্যু কিংবা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে গিয়েও কোনমতে বেঁচে ফিরেছেন, তারা এ কথাটা মনে রাখবেন, আপনাকে বাঁচিয়ে রাখার পেছনে আল্লাহর এক বিরাট উদ্দেশ্য রয়েছে, ইচ্ছা এবং চেষ্টা করলে আপনিও ইতিহাস গড়তে পারেন, হয়ে উঠতে পারেন ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

অতএব নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। লক্ষ্য স্থির করুন, লক্ষ্যে লেগে থাকুন। বিশ্বাস করুন, ইতিহাস গড়ে উঠবে আপনার হাত ধরেই! প্রয়োজন শুধু ধৈর্য, শ্রম আর একাগ্রতার!

www.pathagar.com

আমরা আর সেই ভুল করবো না। প্রমিজ-

তস্কর ইংরেজ কর্তৃক অষ্টাদশ শতাব্দীর যে সময়টাতে (১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ) ভারতবর্ষের স্বাধীনতাটাকে হরণ করা হচ্ছে সে সময়কালে পুরো উপমহাদেশের লোকসংখ্যা ছিল দুইশত পঞ্চাশ মিলিয়ন বা পঁচিশ কোটি। আর এই বিশাল এলাকা, মাদ্রাজ উপকূল হতে শুরু করে ভাগিরথীর পাড়ের সুতানুটী গ্রাম, যা পরে হয়ে উঠে কলকাঠির কোলকাতা, আর ওদিকে খোদ দিল্লি পর্যন্ত পর্যটক, সৈন্য, বণিক-ব্যবসায়ী, কূটনীতিবিদ, ধর্মপ্রচারক ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার ছদ্মাবরণে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইংরেজদের সংখ্যা ছিল মাত্র এক লক্ষেরও কম (সূত্রঃ Rise and fall of the British Empire (Lawrence James, পৃ: ১১৮)।

যে ইংল্যান্ড ভূ-খণ্ড হতে তারা এসেছে পেটের খাদ্যের সন্ধানে, সেই ইংল্যান্ড ছিল জল কাদায় পরিপূর্ণ এক বস্তি মাত্র, পুরো দেশটাতে একমুঠো খাবারের জন্য, কয়েকটা আলুর জন্য ছুটে বেড়াতো সারা বেলা। আর ভারতভূমি? কী ছিল না এদের? শৌর্যে-বীর্যে, সম্পদে-শক্তিতে ভারত ছিল কল্পরাজ্য। পঁচিশ কোটি বনি আদম এখানে দুধের নহরে ভাসছিল, সুখের ঠেলায় তারা ঠিকমত ঘুমুতেও পারতো না! মন মগজে কেবলই কবিতা-শের, সুর আর সুরা, নাচ আর নূপুরের ঝংকার ভাসতো। ভোগের উল্লাসে মেতে থাকতো। ভোগের মাত্রাটা এতটাই প্রকট ছিল যে, একজন মাত্র মহামতি পাঁচ হাজার রক্ষিতা রেখেছিলেন!

কখনও কি ভেবে দেখেছেন? সম্পদ ও শক্তিতে ভরপুর এরকম বিশাল একটা জনপদকে কিভাবে সেই সাতসাগর তেরো নদীর পার হতে এসে মাত্র এক লক্ষ লোক, অর্থাৎ মাত্র একজন ইংরেজ তার জন্মস্থান হতে পাঁচ হাজার মাইল দূরের জনপদে এসে আড়াই হাজার, তথা এক লক্ষ ইংরেজ পঁচিশ কোটি ভারতবাসীকে দাস বানিয়ে রেখেছিল! একদিন নয়, এক মাসও নয়, এক বৎসরও নয়, এক এক করে একশত নব্বইটা বৎসর এদের শোষণ শেষে নিঃস্ব করে দিয়ে যেতে পেরেছে কোন কারণে?

কেন এমনটা হতে পেরেছে বা পেরেছিল, কখনও কি ভেবে দেখেছেন? আপনি তো অনেক জ্ঞানী, অনেক বিদ্যান একজন। ইউনিভার্সিটির সেরা ছাত্র, চমৎকার ঝকঝকে আপনার ক্যারিয়ার। বাড়ি-গাড়ি কিছুরই তো অভাব নেই! আপনি অনেক বড় লেখক, গবেষক বক্তা, শিল্পী, অনেক বড় নেতা। অনেক নাম ডাক আপনার। কিন্তু এই আত্মান্বেষণটা কখনও করে দেখেছেন?

www.pathagar.com

এমনটা হতে পেরেছিল এ কারণে যে, ভারতে মুসলমান নামধারী শাসকরা দু-একজন ব্যতিরেকে আর কেউই আপামর জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের কোনো চিন্তা ও চেষ্টা করেননি। লেখাপড়া চলেছে ব্যক্তির দান দক্ষিণার মাধ্যমে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রের বদান্যতায় নয়। শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা হয়নি। বাইশ হাজার শ্রমিকের ঘাম আর রক্তে এক নাগাড়ে বাইশ বৎসর ধরে বানানো এক তাজমহল বানাতে যে অর্থ গেছে, তা দিয়ে পুরো ভারতে সেকালে অন্তত একশত অক্সফোর্ড, ক্যাম্ব্রিজ বানানো যেতো, কিন্তু সেটা করা হয়নি।

ফলে যুগোপোযোগী শিক্ষা এরা পায়নি। তাই তো ভারত দখল করার পর এক ইংরেজ সুশীল Lord Ellenborough খোদ ভারতে বসেই তার এক সহকর্মীকে আলাপের ছলে বলতে পেরেছিলেন;

'You Know if these gentlemen succeed in educating the natives to the utmost extent of their desire, we should not remain in the country three months. Not three weeks was the reply. (সূত্র : ঐ, পৃ: ১২০)

তুমি কি জানো, এই লোকেরা যদি দেশবাসীকে তাদের সামর্থ্যানুযায়ী সর্বোচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারে, তা হলে আমরা এখানে তিনটি মাসও টিকতে পারবো না। এর জবাবে উক্ত সহকর্মী বিস্ময়ের সাথে বলে উঠলেন; তিন মাস? তিনটি সপ্তাহও না (আমরা এখানে তিনটি সপ্তাহও টিকতে পারবো না)!

এবারে আশা করি বুঝতে পারছেন, আপনি যদি এই দেশ, এই সমাজ আর সবার আগে নিজের কিংবা নিজ আত্মজদের কল্যাণ চান, তবে নিরন্তর জ্ঞানর্চচা করুন, জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারে সাধ্যমত চেষ্টা-প্রচেষ্টা করুন।

পেটের ভাত জোগাড়ের জন্য একটা চাকরির দরকার ছিল, আর ঐ চাকরির জন্যই দরকার ছিল ঝকঝকে একটা সার্টিফিকেট কোনো একটা ইউনিভার্সিটি থেকে, সেটা পেয়েছেন দেখে আপনার জ্ঞানচর্চার প্রয়োজন ফুরিয়েছে ভেবে নিশ্চুপ বসে থাকলে সেটা হবে আত্মহত্যার শামিল। এই ভুলটাই করেছে ভারতবর্ষে আমাদের পূর্বসূরিরা, আর তার সুযোগই নিয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তস্কররা।

আমরা আর সেই একই ভুল করবো না। নিজে বাঁচুন, নিজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচান আর সেই সাথে এই দেশ ও জাতির আগামী দিনের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করুন নিরন্তর জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে। লেগে পড়ুন, আজই, এই মুহূর্তে!

www.pathagar.com

'কলকাঠীর কোলকাতা'!

ষষ্টদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা ছিল পঁচিশ লক্ষ প্রায়, এর শতকরা নব্বই জনই ছিল গ্রামীণ জনপদের অধিবাসী, তারা কাজও করতো মাঠে ময়দানে ফসল ফলাতো, মাছ ধরতো, পশু চরাতো। হাতে গোনা যে ক'টি শিল্প ছিল তা কড়া পাহারায় রাখা হতো। এই সব শিল্প কারখানর ধারে কাছেও এদের ঘেঁষার কোনো সুযোগ ছিল না। সারা বৎসর ভূস্বামী ও জমিদারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই থাকতো। প্রায় দশ হাজারের মত চিহ্নিত দাগি আসামির দাপটে ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল প্রায়। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুন রাহাজানি এসবই ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

পুরো ইংল্যান্ড ছিল স্যাঁতস্যাঁতে কাদামাটিতে ভরপুর! চরম অস্বাস্থ্যকর এ জনপদে যক্ষ্মা, গুটিবসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়ার প্রকোপ ছিল চরমে! দুই বেলা পেট পুরে খেতে পাওয়াটা ছিল ভাগ্যের ব্যাপার (সূত্রঃ Indian Summer; The secret History of the End of an Empire. Alex Von Tunzelmann, পৃঃ ১২)।

কেবলমাত্র কয়েক টুকরো আলুর জন্যও মারামারি হতো এক দলের সাথে আর এক দলের! (সূত্র : ঐ)

এ সময়কালে (ষষ্টদশ শতাব্দীতে) ইংল্যান্ডসহ পুরো ইউরোপের অবস্থাই ছিল অত্যন্ত করুণ। শতকরা পঞ্চাশজন শিশুই প্রথম জন্মবার্ষিকী আসার আগেই মৃত্যুবরণ করতো। মানুষের গড় আয়ু ছিল মাত্র ৩৫ বৎসর! (সূত্রঃ Renaissance Europe ১৪৮০-১৫২০ J.R. Hale, পৃঃ ১৭)

এরকম অভাব ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে রানী এলিজাবেথ চোখে সর্ষে ফুল দেখতে শুরু করেছিলেন। ঠিক এরকম সময়েই তার এক ইহুদি উপদেষ্টা, স্বপ্নবাজ পুরুষ ও দার্শনিক John Dee (১৫৭৭) পরামর্শ দিলেন বিশ্বজুড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য (British Empire) প্রতিষ্ঠার। তার মুখে এমন কথা শুনে রানী স্বয়ং আর সে সাথে তার অন্যান্য সভাসদরা হেসেই খুন! নিজেরা দুই বেলা পেট পুরে খেতে পাই না, এর মধ্যে আবার বিশ্বজুড়ে ব্রিটিশ এম্পায়ার! পাগল নাকি লোকটা!

লন্ডনের এক ব্যবসায়ী Ralph Fitch ব্যবসায় সুবিধা করতে না পেরে বাজার খুঁজতে গেলেন স্পেনে। সেখানে ব্যবসার সুযোগ না পেলেও খবর পেলেন যে, পর্তুগালের ব্যবসায়ীরা ভারত থেকে মসলা, মসলিন, সুগন্ধি আর দাস শ্রমিক এনে ব্যবসার মাধ্যমে কেবল লাভই করছে না, তারা

www.pathagar.com

ভারতের উপকূলে নিজেদের জমিদারিও প্রতিষ্ঠা করেছে। ব্যবসার সন্ধানে Ralph ছুটলেন ভারতের পানে।

ভারতে পণ্য হিসেবে কোন জিনিসটার চাহিদা আছে? সেটা জানা না থাকলেও Ralph জাহাজে নিজের রসদের মধ্যে কয়েক ব্যারেল আঙ্গুর থেকে উৎপাদিত বিখ্যাত স্প্যানিশ মদ নিয়ে নিলেন। বিক্রি না হলেও সমস্যা নেই, নিজেরতো কাজে লাগবে, আর তা ছাড়া বিক্রি হবেই বা না কেন? ভারতে পর্তুগিজ নাবিক ও সৈন্যরা রয়েছেই, তারাই কিনবে। গিয়ে নামলেন ভারতের উপকূলে।

ভারতে নেমে এ দেশের ঐশ্বর্য ও সম্পদের প্রাচুর্যতা, সহজ জীবন যাপন প্রণালী সুখ শান্তি দেখে তো Ralph এর চোখ কপালে উঠার উপক্রম! এত সম্পদ এত সুখ পৃথিবীতে আছে? তিনি গেলেন আগ্রা, সেখান থেকে ফতেহপুর সিক্রি, দিল্লি। যত দেখেন, ততই তার বিস্ময়ের মাত্রা বেড়ে যায়।

আকবর তখন মোগল সম্রাট, চতুর Ralph ভিড়ে যায় মোগল দরবারে। স্প্যানিশ মদ, ইউরোপ থেকে আনা দূরবীন উপহার হিসেবে দিয়ে আকবরের মন জয় করেন। মোগল রাজ দরবার সেই প্রথম স্প্যানিশ আঙ্গুর থেকে উৎপাদিত মদের স্বাদ চেখে দেখলো! নেশাখোর মাতালের জিহ্বাতে তার স্বাদ অমৃত ঠেকলো! ব্যাস হয়ে গেল মাতালে মাতালে বন্ধুত্ব!

ক'দিন না যেতেই Ralph দেশে তার এক বন্ধুকে চিঠি লিখলেন;

'Gilded and silk draped carriages pilled by miniature oxen, and roads lined with markets selling victuals and gemstones. The king hath in Agra and Fatepore, as they do credibly report, a thousand Elephants, thirty thousand Horses, fourteen hundred tame Deer, eight Hundred Concubines---' (সূত্রঃ Indian Summer; The secret History of the End of an Empire. Alex Von Tunzelmann, পৃঃ ১৩)

ভাবানুবাদ : সোনা আর রেশমি কাপড়ে মোড়া গরুর গাড়ি ভর্তি হীরা-জহরত আর রাস্তার পাশে সারি সারি খাবার দোকানে ঠাসা বাজার! আগ্রা এবং ফতেহপুরে বাদশাহর রয়েছে এক হাজার হাতি, ত্রিশ হাজার ঘোড়া, এক হাজার চারশত হরিণ, আটশত রক্ষিতা-মর্মে যে সংবাদ পাওয়া যায়, তা যথার্থ।

এর চিঠিটা ইংল্যান্ডে পৌছুলে লন্ডনে হইচই পড়ে যায়। সভাসদদের পরামর্শে রানী তড়িঘড়ি করে বাদশাহ আকবরের কাছে চিঠি পাঠান Ralph

www.pathagar.com

কে তার দরবারে ব্রিটিশ দূত হিসেবে বরণ করে নিতে। সুরা পানের সঙ্গী হিসেবে ইতোমধ্যেই বন্ধুত্ব গড়ে ওঠা Ralph কে আকবর সে হিসেবেই গ্রহণ করলেন। সেই শুরু।

সেই বন্ধুকে বাদশাহ আকবর আশ্রয় দিয়েছেন, নিরাপত্তা দিয়েছেন, নিজের যে পাঁচ হাজার রক্ষিতা ছিল মনোরঞ্জনের জন্য সেখান থেকে সুন্দরীও সরবরাহ করেছেন। Ralph এর দিন কেটেছে রাজকীয় হালে। তবে সে নিজের দেশের জন্য কাজ করতে ভুল করেনি। বাদশাহ ও তার রাজপুত্রদের সাথে সখ্যতা গড়ে Ralph প্রথমে Elizabeth's Levant Company এবং পরে East India Company নামে ব্রিটিশদের জন্য বিনা শুল্কে ব্যবসা করার অনুমতি আদায় করে নেয়। ব্যবসা করতে থাকে কোম্পানি, আর লভ্যাংশ পাঠাতে থাকে ইংল্যান্ডে!

সেই শুরু। মাঝখানে অনেক চড়াই উতরাই পেরিয়ে তারা ভারতের নিজেদের ব্যবসা বাড়িয়েছে। ব্যবসা পরিচালনার জন্য তারা কুঠি বানিয়েছে, কুঠি পাহারা দেয়ার জন্য লোকবলের প্রয়োজন পড়েছে, সেই প্রয়োজনও তারা পূরণ করেছে ইংল্যান্ড থেকে লোক এনেই।

বৈরী পরিবেশে টিকে থাকার মত, পরের ধন-সম্পদ লুট করার মত, লুট করা সম্পদ শক্তি প্রয়োগে রক্ষা করার মত শারীরিক ও মানসিক শক্তিসম্পন্ন লোক দরকার ছিল কোম্পানির, তাই তারা সে রকম লোকই ধরে ধরে এনেছে। এই সময়ে ঐ সব ভ্যাগাবণ্ড চরিত্রের লোক, যারা পুরো ইংল্যান্ডে মাস্তানি করে জনগণের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল, তারা এক এক করে চলে আসতে থাকে ভারতে কোম্পানির কর্মচারী হিসেবে। রানী এলিজাবেথ হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

এইসব নির্দয়, লোভী, নৃশংস ও বাটপাড় চরিত্রের লোকগুলোই বাংলায় এসেছিল। আসন গেড়েছিল সুতানুটি নামক এক জলাভূমি, জেলেদের গ্রামে, রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে নিরাপদ দূরত্বে, যেন নবাব তাড়া করলে ওরা নদীপথে দ্রুত পালাতে পারে।

সঙ্গত কারণেই ওদের দরকার পড়লো স্থানীয় কুলি, পথ চেনানোর জন্য স্থানীয় লোক, কর্মচারী, লোকাল চর গোয়েন্দা। পয়সার বিনিময়ে তাও তারা পেলো। সমচরিত্রের লোকজনই তাদের কাছে ভিড়লো। দিনে দিনে লোক বাড়তে থাকলো, বসতি গড়ে উঠতে থাকলো। লোকসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে বাড়ি, বাজার রাস্তা ঘাটও বাড়তে থাকলো। একদিনের ছোট্ট অখ্যাত জেলেপল্লী সুতানুটি, এখানে বসেই সকল কলকাঠি নাড়া হতে থাকলো, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকলো এ জনপদ, ১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে জব চার্নকের

www.pathagar.com

হাতে গোড়াপত্তন হয়ে গড়ে উঠতে থাকলো কোলকাতা। 'কলকাঠীর কোলকাতা'!

সারা বাংলা, এমনকি সারা ভারত থেকে লোভাতুর, খল, শঠ ও দুর্বৃত্ত প্রকৃতির লোকগুলো কেবলমাত্র অর্থ কামাই, মদ নারী আর ভোগের উদ্দেশ্যে এসে জমা হতে থাকলো এ জনপদে। পরবর্তী চারটি দশকে এ নগরী এমন একটা নৈতিক ও সামাজিক অবস্থানে এসে পৌঁছেছে যে, তা দেখে তস্কর ও নৃশংস চরিত্রের রবার্ট ক্লাইভও বলতে বাধ্য হয়েছিলেন; পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ঠতম জায়গাগুলোর মধ্যে অন্যতম একটা হলো কোলকাতা! তার নিজের ভাষায়;

Calcutta is one of the most wicked places in the Universe (সূত্র : White Mughals, William Dalrymple, পৃ: ৩৩)

ক্লাইভের এ কথার যথার্থতা বুঝতে হলে যাদের হাতে কোলকাতার গোড়াপত্তন, তাদের চরিত্র বুঝতে হবে, যে ইংল্যান্ড হতে এরা এসেছে সেই ইংল্যান্ডের সমসাময়িক সমাজব্যবস্থা এদের চরিত্রকে চিত্রিত করে। তখনকার ইংল্যান্ডে নীতিহীনতা, অনৈতিকতা ও সামাজিক অনাচার এতটাই প্রকট ছিল যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে শতকরা তেত্রিশ জনই ছিল বিবাহবহির্ভূত জারজ সন্তান। (সূত্র: ঐ, পৃ:৬২)

নতুন এ নগরীতে এসেও তারা আরও প্রকটভাবে তাদের সে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ করতে থাকে। এ কটা উদাহরণ দেই, ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে সর্বমোট ৭১০ জন ইংরেজ সৈন্য ছিল (২৬ রেজিমেন্ট)। এরা ঐ বৎসরে কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যেও ৫৩২০ গ্যালন (২৪১৫২ লিটার) দেশি মদ, ২২০ গ্যালন (৯৯৮ লিটার) ব্রান্ডি, ২৪৯ গ্যালন (১১৩০ লিটার) জিন এবং ২০৭ ব্যারেল (প্রতিটিতে সাড়ে বাহান্নো গ্যালন বা ৪৯৩৩৮ লিটার) বিয়ার পান করেছে! (সূত্র: Raj; The making and Unmaking of British India, Lawrence James, পৃ: ১৩৮)

তার মানে দাঁড়ালো সামরিক বাহিনীর নিয়ম নীতি ভঙ্গ করেই মাত্র সাতশত জন্য ইংরেজ সৈনিক ঐ বৎসরে সর্বমোট ৭৫৬১৮ লিটার মদ পান করেছে, মাথাপিছু এই হার ১০৮ লিটার প্রায়। এ বিরাট পরিমাণ পানীয় সমসাময়িক কালে ইংল্যান্ডে বসে একজন ইংরেজ কল্পনাও করতে পারতো না কেবলমাত্র আর্থিক কারণে! এখানেই শেষ নয়, এর উপরে ছিল গাঁজা সেবন। ভারতে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও উৎসাহে আফিমের চাষ হতো। এটা তাদের জন্য অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা ছিল। ইংরেজরা এই আফিম ভারতীয়দের কাছে উচ্চমূল্যে বিক্রি করতো তো বটেই, নিজেদের উৎপাদিত

www.pathagar.com

এ মহার্ঘ বস্তুটি নিজেরাও যথেচ্ছাভাবে সেবন করতো। এর অনিবার্য পরিণতি হিসেবে ব্যক্তির নৈতিক অধঃপতন ছিল অপ্রতিরোধ্য এবং এর ফলে সামাজিক অনাচারও ছিল মহামারী আকারে। রক্ষণশীল ভারতীয় সমাজের এ নগরীতে যৌনতা ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক রিপোর্টে দেখা যায় যে, ১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালে বাংলা প্রদেশে যত ইংরেজ সৈন্য নিয়োজিত ছিল, তাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৩১ জনই যৌনরোগে আক্রান্ত ছিল। (সূত্র : ঐ, পৃ: ১৩৯)

এ পটভূমি ও ইতিহাসটুকু জানা থাকলে আমাদের বাঙালি সমাজে এর প্রভাব, প্রতিক্রিয়া ও পরিণাম কী হয়েছিল সেটা বুঝে উঠা সহজ হয়। তা না হলে ধান্দাবাজ পেইড ঐতিহাসিকদের বিকৃত তথ্যে বিভ্রান্ত হতেই হবে।

www.pathagar.com

গ্রানাডার কান্না

মুসলিম স্পেনের পতন পরবর্তীতে সেখানে অবস্থানরত মুসলমানদের কী অবস্থা হয়েছিল? সে বিষয়টা নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা খুব কমই হয়েছে। যা হয়েছে তাও পর্যাপ্ত নয়। বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণের পর ইসলাম হতে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের তারা খ্রিষ্টান হিসেবে বিবেচনা করেনি, বরং তৎকালীন স্পেন সরকার, বিশেষ করে, পাদ্রিরা এইসব খ্রিষ্টানদের 'মরিস্কো' (Morisco) নামের এক নতুন অভিধায় অভিহিত করতে থাকে। শক্তি প্রদর্শনে ভীত হয়ে জীবন বাঁচাতে ইসলাম বর্জনের ঘোষণা প্রদানকারী এইসব মুসলমানরা খ্রিষ্টকে নিজেদের ত্রাতা এবং ত্রিত্ববাদে নিজেদের বিশ্বাস স্থানের ঘোষণা দিয়ে ইনকুইজিশন আদালতের রায়ে আগুনে পোড়ার হাত থেকে আপতত বেঁচে গেলেও মূল খ্রিষ্টবাদী স্প্যানিশ গোষ্ঠীর সাথে তাদের দূরত্ব কমেনি।

'মরিস্কো' নামের এইসব নব্য খ্রিষ্টান, যারা দু'দিন আগেও ছিল মুসলমান, নৃতাত্ত্বিক, আর্থ-সামাজিক, সংস্কৃতিকসহ বিভিন্ন দিক বিচারে এদের সম্পৃক্ততা ছিল সমুদ্রপাড়ের তিউনিশিয়া, মরক্কো ও আলজেরিয়ার বাসিন্দাদের সাথে। এদের অনেকেরই প্রধান ভাষা ছিল আরবি। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে আচার-আচরণ, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জীবন-যাপন প্রণালীর সাথে সাগরপাড়ের ঐসব দেশের মানুষের সাদৃশ্য ছিল সবচেয়ে বেশি, এর প্রধান কারণ ছিল; প্রথমত, এদের অধিকাংশের পূর্বপুরুষগণ ঐ সব দেশ হতে এসে আন্দালুস তথা স্পেনে এসে বসতি গেড়েছেন, আর দ্বিতীয় অন্যতম কারণ হলো, তাদের এক ও অভিন্ন ধর্মবিশ্বাস; ইসলাম।

স্পেনের তৎকালীন সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপস (১৫৫৬-৯৮) এ অবস্থাকে স্পেনের নিরাপত্তা ও জাতীয় ঐক্যের জন্য হুমকিস্বরূপ মনে করে এইসব মরিস্কোদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের উপরে, তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিক স্বকীয়তার উপরে আঘাত করলেন। তিনি ১৫৬৭ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনে আরবি ভাষা শিক্ষা ও ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। এর পাশাপাশি আরবি ও ইসলামি ঐতিহ্যবাহী পোশাক, নারীদের হিজাব ও লম্বা পোশাক (ঘাগরা) পরিধান ও ব্যবহার নিষিদ্ধ ও তা অমান্য করাটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করে এক রাজকীয় ডিক্রি জারি করেন।

সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপ কর্তৃক এই সরকারি ডিক্রি জারি করাটা ছিল ফার্ডিন্যান্ড কর্তৃক মুসলমানদের কাছ থেকে স্পেন কেড়ে নেয়ার প্রায় পৌনে একটি

www.pathagar.com

শতাব্দী পরে এসে ইসলাম ও মুসলমানদের উপরে সবচেয়ে বড় আঘাত, বলা চলে চূড়ান্ত আঘাত!

মরিস্কোরা সরকারের এ আদেশের ফলে যার পর নাই ক্ষুব্ধ হন। তারা তাদেরই এক শীর্ষ নেতা, যিনি নিজেও একজন মরিস্কো এবং স্প্যানিশ সরকার ও প্রশাসনের অতি কাছের লোক হিসেবে পরিচিত ছিলেন, সেই Francisco Nunez Muley এর মাধ্যমে গ্রানাডার প্রধান বিচারপতি Pedro De Deza বরাবর একটি লিখিত আবেদন করেন, একটা কথা বলে রাখা ভালো, এ আবেদন পত্রটাকে কোথাও কোথাও খাপছাড়া মনে হতে পারে। এর মর্ম যথাযথভাবে বুঝতে হলে সেই সময়কার স্পেন ও ইসলাম পারস্পরিক সম্পর্ককে বুঝতে হবে। আবার উল্টোভাবেও বলা যায়, এটাকে বুঝতে পারলে সেকালে ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে স্প্যানিশ সমাজের সম্পর্কটাকে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করা যায়।

যাহোক, উক্ত আবেদনটির হুবহু বাংলা অনুবাদ তুলে দিলাম, দেখুন।

'মহাত্মন, যখন এ রাজ্যের অধিবাসীদের খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসে ধর্মান্তরিত করা হয়, তখন তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-আচরণসহ পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা বা তেমন কোনো বিধি নিষেধ ছিল না। আর প্রকৃতপক্ষে এসব জনগোষ্ঠীকে আমীর আবু আব্দুল্লাহর সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করেই খ্রিষ্টধর্ম এখন 'সহজেই বাস্তবায়নযোগ্য' বিজ্ঞজনোচিত ঘোষিত নতুন নির্দেশনাসমূহ হতভাগ্য এ জনগোষ্ঠীর উপরে কী মর্মান্তিক ও ভয়ানক বিপর্যয় ডেকে এনেছে- তা বিজ্ঞ আদালতের সামনে তুলে ধরতে চাই এ সব নির্যাতিত হতভাগ্য প্রজাবর্গের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন এবং মহামান্য সম্রাটের পক্ষ থেকে দেয়া নিরাপত্তা পূর্বের মতই সংরক্ষণ করবেন।

আমাদের নারীদের ব্যবহৃত পোশাক 'ইসলামি' নয়। বরং Castile সহ অন্যান্য এলাকার জনগণের পোশাক পরিচ্ছদের বিচিত্রতার মত আমাদের এসব নারীদের মাথায় হিজাব, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ এ সবই আঞ্চলিক প্রথানির্ভর। কেউ কি অস্বীকার করতে পারে যে, আমাদের নারীদের পোশাক পরিচ্ছদ মুসলমান এবং তুর্কিদের চেয়ে পৃথক। মুসলমানদের পোশাক পরিচ্ছদের মধ্যে ব্যাপক ভিন্নতা, ব্যাপক বিচিত্রতা রয়েছে। এমনকি ফেজ (ঋবু বর্তমান মরক্কোর একটি শহর) এর অধিবাসীদের পোশাক পরিচ্ছদ তার নিকটতম Tlemcen শহরের পোশাক পরিচ্ছদ এক রকম নয়। একই রকম বিচিত্রতায় ভরপুর তিউনিশিয়া এবং মরক্কোর নারীদের পোশাক পরিচ্ছদও এক রকম নয়। সেই একই বিচিত্রতায় ভরপুর তুরস্কসহ অন্যান্য

www.pathagar.com

এলাকার পোশাক পরিচ্ছদগুলো (এগুলোর সবগুলোই আঞ্চলিকতা নির্ভর, ইসলামিক নয়।)

আমাদের এখানে প্রায়ই সিরিয়া এবং মিশর হতে খ্রিষ্টান পাদ্রিরা আসেন আমাদের সাথে দেখা করতে (তারাও তুর্কি, তবে মুসলমান নয়) তারাও আলখেল্লা পরেন, তারা Castile কিংবা ল্যাটিন ভাষায় কথা বলেন না, তারা বরং আরবি ভাষায় কথা বলেন, অথচ তারা সকলেই খ্রিষ্টান। (অর্থাৎ মুসলমানদের মত কোর্তা বা পোশাক পরিধান করা বা আরবি ভাষায় কথা বলার কারণে তাদেরকে মুসলমান হিসেবে চিত্রিত করা হয় না।)

আমাদের সমাজে মহিলারা তাদের তিন চার উর্ধ্বতন বংশধর; প্রৌঢ়া দাদী-নানীদের কাছ থেকে তাদের বিবাহকালীন বিশেষ ধরনের পোশাক সংগ্রহ করে রাখে। কী লাভ হবে প্রভূত অর্থ ব্যয়ে তৈরি আমাদের ঐতিহ্যগত এসব পোশাক নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে? তিরিশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা বিনিয়োগের মাধ্যমে বানানো আমাদের এইসব পোশাক কারখানা বাজেয়াপ্ত করে সরকারের কী লাভ হবে? এসব কারখানার উপর নির্ভরশীল পোশাক বুননকর্মী, সরবরাহকারী, মজুদদার ও ব্যবসায়ীসহ লক্ষ লক্ষ কর্মীর জীবিকার পথ রুদ্ধ করে দিয়ে সরকারের কী লাভ হবে? এ অঞ্চলের দুই লক্ষ নারীর যদি রাতারাতি পোশাক পরিবর্তন করতে হয়, তবে কোথা হতে তারা এ বিশাল পরিমাণ অর্থ জোগাড় করবে? আর এই মরিস্কো সম্প্রদায়ের কী বিশাল পরিমাণই না ধ্বংস হবে! এ অঢেল পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কার ও অর্থের অপচয় দ্বারা রাষ্ট্রও বঞ্চিত হবে এক বিরাট কর প্রাপ্তি থেকে!

আমরা মহামান্য সম্রাটের অনুগত প্রজা অথচ আমাদেরকে ধর্মহীন আদালতে বিচারের নামে নিপীড়নের মুখোমুখি করা হচ্ছে। আত্মসমর্পণের পর হতে এ অবধি আমরা কেউ কখনও দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছি, এরকম অপবাদও আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারে নি–

বিবাহসহ অন্যান্য পার্বণাদি আমাদের খাবার, আনন্দ উদযাপনের পদ্ধতি, আমাদের গান বাজনা এগুলো প্রকৃত খ্রিষ্টান হওয়ার পথে কোনো বাধা বা প্রতিবন্ধকতা নয়। আমাদের সংগীত আফ্রিকা বা তুরস্কের নয় বরং তা পুরোপুরিই আঞ্চলিক। এগুলো যদি বিশেষ কোনো ধর্মগোষ্ঠীর (মুসলমানদের) হতো, তবে তা অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসরত ঐ গোষ্ঠীর মধ্যেও দেখা যেতো।

মেহেদিকে মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাসের সাথে ভাবার কোনো কারণ নেই। আমাদের মেয়েরা মেহেদি ব্যবহার করে মাথা পরিষ্কার ও চুল রঙ করার কাজে। এটা স্বাস্থ্যকর এবং কোনক্রমেই খ্রিষ্টধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রের কী লাভ হবে আমাদের বাড়ির দরজাগুলো সার্বক্ষণিক খোলা রাখতে বাধ্য করার মাধ্যমে? এতে করে চুরি-রাহাজানিসহ নারীর প্রতি সহিংস ঘটনার প্রাদুর্ভাব ঘটবে। যদি সত্যিই কেউ গোপনে গোপনে মুসলমানদের রীতিনীতির চর্চা করতে চায় তবে কি তারা রাতের আঁধারে করতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে। ইসলাম ধর্মের অনুশাসন নীরবে নিভৃতেও পালন করা যায়। অন্তরে যদি কারো উদ্দেশ্য থাকে যে সে আল্লাহর উপাসনা করবে, তা হলে বাড়ির দরজা খোলা রাখা বা না রাখায় কী যায় আসে? আল্লাহর কাছে অন্তরের কোনো বিষয়ই গোপন থাকে না।

আমাদের হাম্মাখানাগুলোর কী দোষ? সেগুলোও কি ইসলাম ধর্মের অনুষঙ্গ? এসব হাম্মামখানাগুলোতে তো খ্রিষ্টানদের মধ্য হতেও অনেকে আসে! এসব গোছলখানাগুলো ময়লা আবর্জনায় পরিপূর্ণ, অপরপক্ষে মুসলমানদের ধর্ম পালনে পূর্ণ পবিত্রতার প্রয়োজন হয়। পৃথিবীর সবখানেই সব সময়ই গোছলখানার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল ও আছেও। এসব গোছলখানা গুলো বন্ধ করে দেওয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রের কী লাভ হবে? আমাদের মেয়েরা গোছলের জন্য কোথায় যাবে?

আমাদের মেয়েদের মুখমণ্ডল খোলা রাখতে বাধ্য করার ফলে পাপাচারী পুরুষদের এসব নারীদের প্রতি আকৃষ্ট করবে মাত্র। এতে রাষ্ট্রের আর কী লাভ হবে? খ্রিষ্টান নারীদের মত তারাও পর্দা করে, এতে তারা সহিংসতার হাত থেকে বেঁচে থাকতে পারে। আমাদের নামের শেষে ব্যবহৃত পদবি ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের বংশীয় পরিচয় ও ক্রমধারা রক্ষা করা হয়। এ বংশীয় পরিচয়টুকু পরিত্যাগে বাধ্য করার মাধ্যমে রাষ্ট্রের কোনোই লাভ হবে না।

আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় পীড়াদায়ক বিষয় হলো, আমাদের মাতৃভাষা আরবি হারানোর ঘটনা। একটি গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা, যে ভাষার পরিমন্ডলে তারা জন্ম নিয়েছে, বেড়ে উঠেছে, যা তাদের মাতৃভাষা, তা কিভাবে কেড়ে নেয়া যেতে পারে? মিশর, সিরিয়া, মাল্টার অধিবাসীরাও আরবি ভাষায় কথা বলছে, তারাও আমাদের মতই খ্রিষ্টান।

আমাদের এ গোষ্ঠী এমন এক পরিমন্ডলে জন্মেছে, এমন এক পরিমন্ডলে বেড়ে উঠেছে যেখানে কখনই Castilian ভাষা ব্যবহৃত হয়নি। নির্দেশিত তিন বৎসরের মধ্যে আমাদের জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে, এ জনগোষ্ঠীর পৌঢ় নর-নারীদের পক্ষে এ ভাষা শেখাটা এক কথায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। এরা জন্ম হতেই আরবি ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত। এ ব্যবস্থাটা সুস্পষ্টভাবেই আমাদের জনগোষ্ঠীকে দুর্বল করার জন্যই গৃহিত হয়েছে।

www.pathagar.com

আর যারা এ কঠোর নির্দেশটি পালন করতে পারবে না তারা সমাজ থেকে ছিটকে পড়তে বাধ্য হবে এবং দেশ ছাড়া হবে। আফ্রিকার কুখ্যাত সন্ত্রাসী নিগ্রোদেরও তাদের নিজস্ব ভাষার অধিকার কেড়ে নেয়া হয় না, তাদের নিজস্ব ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি মেনে চলতে দেয়া হয়। আমাদের, মরিস্কোদের তা দেয়া হচ্ছে না।

অত্যন্ত নিষ্কলুষ মন নিয়ে আমি এ আবেদনটি লিখলাম। দীর্ঘ ষাট বৎসর আমি প্রভু ঈশ্বর, মহামান্য সম্রাট ও দেশবাসীর সেবা করে আসছি। মহানুভব, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের এ হতভাগ্য, নির্যাতিত ও অক্ষম জনগোষ্ঠীর প্রতি দয়া ও সুবিচার করবেন। মহামান্য সম্রাটের এসব অনুগত প্রজাদের আবেদন মঞ্জুর করে তাদের দুঃখ, কষ্ট ও ক্লেশ দূর করবেন এবং তারা যেন অনাগত কাল ধরে ঈশ্বর ও মহামান্য সম্রাটসহ এ দেশের অনুগত থেকে তাদের ঋণ শোধ করতে পারে- সে সুযোগ দান করবেন।'

বলাই বাহুল্য, মুসলমান থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে নব্য খ্রিষ্টান হওয়া এইসব মরিস্কোদের এই করুণ আবেদন মহামান্য রাজা মঞ্জুর করেন নি। ফলে এ ঘটনার মাত্র তিন বৎসর পরে কোনো মরিস্কোর বাড়িতে দরজা ছিল না। তারা মাথায় কাপড় দিতে পারতো না, ইসলামি পোশাক পরতে পারতো না। আরবি ভাষায় কথা বলতে পারতো না, আরবি পড়া বন্ধ করা হয়েছিল। কুরআনের কোনে কপি তো দূরের কথা আরবি ভাষার কোনো বইও রাখতে দেয়া হয়নি। তাদের তাঁতগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। তাদের হাম্মামখানা বা গোছলখানার দরজা খুলে নেয়া হয়েছিল এই কারণে যে, হাম্মামখানায় ঢুকে হয়তো মুসলমানরা নামাজ পড়বে (অনেকে পড়তো, এরকম গোয়েন্দা তথ্য ছিল সরকারের কাছে)! হালালভাবে পশু জবাই করা হয়েছিল। মরিস্কো পরিবারের (প্রাক্তন মুসলমান) মেয়েদের সাথে আদি খ্রিষ্টান পরিবারে বিয়ে দেয়া হতো সরকারি ক্ষমতা খাটিয়ে, মেয়ে ও তার অভিভাবকের মতের বিরুদ্ধেই। আর মাত্র অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই স্পেন থেকে মুসলমান ও ইসলামের নাম গন্ধটুকু দূরীভূত হয়ে যায়

www.pathagar.com

অপেক্ষা কেবল সময়ের!!

সেই ন্যাংড়া লোকটা এসেছিল দিল্লিতে। এসেছিল এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে, ২২ শে সেপ্টেম্বর শনিবার, ১৩৯৮, এসে থামলো সিন্ধু নদীর পাড়ে। দুই দিন ধরে চললো নৌকার সাথে নৌকা জোড়া দিয়ে ব্রিজ বানানোর কাজ।

তার সে সৈন্যবাহিনী এতটা বড় ও শক্তিশালী ছিল না যে, তারা ভারতের মত ধনাঢ্য দেশের শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীকে মোকাবেলা করার সাহস করতে পারে। কিন্তু তার পরেও ন্যাংড়া লোকটা জেনে শুনেই এসেছিল, সাহসও করেছিল।

সাহস করার যথেষ্ট কারণও ছিল। প্রায় দশ বৎসর হলো সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ইন্তেকাল করেছেন। এর পরে এক এক করে রাজ্যের ক্ষমতা হাতে নিতে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সংঘাত আর ষড়যন্ত্র চলে আসছে। দিল্লির শাসন ক্ষমতায় আসীন সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক কোনো কূলকিনারা করতে পারছেন না। কে যে বন্ধু, আর কে দুশমন সেটাই তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র এতটাই জটিল আকার ধারণ করেছে!

প্রায় দশটা বৎসর কোনো শক্তিশালী সরকার দিল্লির ক্ষমতায় নেই। উজির-নাজির, সভাসদরা নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত। দেশ ও সমাজের উন্নতি বা নিরাপত্তার চিন্তা কারও মাথায় নেই। এমনতর খবর বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়েছে কান্দাহার, ইস্পাহান, সমরখন্দ আর মধ্য এশিয়ায়। মোঙ্গলরাও জানলো, শুনলো, প্রলুব্ধ হলো ভারত আক্রমণে ।

এর আগে তাদেরই পূর্বপুরুষ চেঙ্গিস খান ১২২১ খ্রিষ্টাব্দে এই সিন্ধুর তীর থেকেই ফেরত গেছে। সিন্ধুর পুর্ব পাড়ে আর এগোয়নি। কিন্তু তারই বংশধর ন্যাংড়া লোকটা; তৈমুর লং এবারে তার দলবল নিয়ে নদী কেবল পারই হলো না, বরং সে ঝড়ের বেগে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব দিকে ছুটে চললো।

চলার পথে যে জনপদই তার সামনে পড়লো সে জনপদকেই সে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে রক্তের বন্যা বইয়ে দিতে থাকলো। হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ আর লুটতরাজ ছিল যথেচ্ছ! কেবলমাত্র সুস্থ ও সবল জোওয়ান পুরুষ, যাদের দাস হিসেবে বিক্রি করা যাবে, শেকলে বেঁধে নিয়ে চললো। এর বাইরে যারাই তার সামনে পড়লো নারী বৃদ্ধ শিশু, সবাইকেই তার তরবারির নিচে প্রাণ দিতে হলো।

বলা হয়ে থাকে, লাশের পচা গন্ধ থেকে বাঁচতেই তৈমুরের সৈন্যরা

www.pathagar.com

দ্রুতবেগে এগিয়েছে! আর এভাবেই তারা ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের দিকে দিল্লির দোরগোড়ায় হাজির!

দিল্লির মসনদ নিয়ে তখনও আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ সংঘাত চলছে বিভিন্ন দল আর উপদলে। এরকমই একটা উপদলের নেতা, স্বঘোষিত সুলতান মাহমুদ শাহ বাছ বিচার না করেই তৈমুর লং এর সৈন্যবাহিনীর উপরে আক্রমণ করে বসে। ১৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর, বুধবার। মাত্র কয়েক ঘণ্টায় সে আক্রমণ ঠেকিয়ে দেয় তৈমুরের সেনাদল।

তবে তৈমুর কেবল তাতেই সন্তুষ্ট থাকেনি। তার সৈন্যদের আক্রমণ করা হয়েছে, এটা জানার পরে সে এতটাই ক্রোধান্বিত হয় যে, তৎক্ষণাৎ সে দিল্লিবাসীর উপরে এর প্রতিশোধ নেয়ার নির্দেশ দেয়।

আহা কি করুণ দিন-ই না ছিল সে বুধবারটা! দিল্লিবাসীর উপরে নরক নেমে এসেছিল যেন। মাত্র একটা ঘণ্টার মধ্যে দিল্লিতে পঞ্চাশ হাজার লোককে হত্যা করে তারা। এমনকি, তৈমুরের দলে অশীতিপর বৃদ্ধ ইমাম, যে নিজের হাতে ভারি তরবারিটাও ধরতে অক্ষম, সেই তাকেও বাধ্য করা হয়েছে বন্দী ভারতীয়র মাথা কাটতে!

মাহমুদ শাহ পালিয়ে গেলেও অচিরেই তার প্রধানমন্ত্রী মালু খান-এর নেতৃত্বে দশ হাজার অশ্বারোহী, চল্লিশ হাজার পদাতিক এবং বিরাট এক হস্তিবাহিনী নিয়ে আবারও মাঠে আসলেন, কিন্তু এবারেও তারা সফল হলো না। কারণ, ঐ যে, নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস, দ্বন্দ্ব আর বিদ্বেষ! ফলাফল কি হলো? তৈমুর লং এর এক একজন সৈন্য গড়ে প্রায় কুড়িজন ভারতীয়কে শেঁকলে বেঁধে বন্দী হিসেবে ক্যাম্পে আনলো। সারা রাত ধরে দিল্লির প্রতিটি অলিতে গলিতে, প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে চললো লুট-তরাজ আর ধর্ষণ! লাশের পর লাশ দিল্লির পথে ঘাটে, যেখানে সেখানে পড়ে থাকলো! প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও সেই সব লাশে পচন ধরতে শুরু করলে পচা লাশের গন্ধে টেকা দায় হয়ে উঠলো! শেষ পর্যন্ত আর টিকতে না পেরে প্রায় নয় দিন থাকার পরে দশম দিনে তৈমুর তল্পিতল্পা গুটাতে শুরু করলো।

আসার সময় তারা ঝড়ের বেগে এসেছিল পেছনে পচা লাশের গন্ধের হাত থেকে বাঁচার জন্য। এবার যাবার সময়ও ঠিক সেই একই অবস্থা, বাতাসে লাশের পচা গন্ধ! কিন্তু তৈমুরের সেনাবাহিনী দিনে চার মাইলের বেশি এগুতে পারেনি!

কারণ, তারা দিল্লি থেকে এত সম্পদ লুট করেছে যে, তাদের ঘোড়াগুলোও সে সম্পদ টেনে নিতে হিমশিম খেয়েছে! বলা হয়ে থাকে; দিল্লি ও তার আশপাশে এতটাই দুর্গন্ধ ছড়িয়েছিল যে, ঐ দুই মাসে দিল্লির আকাশে

www.pathagar.com

একটা পাখিও ওড়েনি! এ সবই এক দুঃসহ স্মৃতি।

আরও একটা স্মৃতি আছে বটে! তৈমুর লং এর সেই বৃদ্ধ ইমাম, যে মানুষ হত্যা করতে না চাইলেও তাকে দিয়ে জোর করে ভারতীয় বন্দীর মাথা কাটানো হয়েছে, সেই বৃদ্ধ ইমাম ১৪ ডিসেম্বর শুক্রবার দিল্লির মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়ান। সেখানে তিনি দিল্লিজয়ী তৈমুর লং এর নামে খুতবাও দেন। সেই খুতবায় তার মহান মনিব তৈমুর লং এর প্রশংসা করে খুতবায় যা বলেছিলেন, তা স্মৃতি নয়।

স্মৃতি হলো, তিনি তার সেই খুতবায় অশ্রুসিক্ত নয়নে কম্পিত কণ্ঠে বলেছিলেন; যে জাতি আল্লাহর অবাধ্য হয়, যে জাতি আল্লাহর রজ্জুকে সম্মিলিতভাবে আঁকড়ে ধরে না, তার পাবন্দি করে না, সেই জাতির উপরে আল্লাহ আজাব নাজিল করেন। আর আল্লাহর আজাব যখন আসে, তখন তা হতে পালিয়ে বাঁচার কোনো পথ থাকে না। আল্লাহর পাকড়াও হতে কেউ বাঁচতে পারে না।

এর পরে ইতিহাস সাক্ষী। সাক্ষী এই জনপদ, এমনকি, আমরা এই বঙ্গবাসী সকলেই। দিল্লিবাসী সেদিন সেই খুতবা থেকে শিক্ষা নেয়নি, আমরাও সে খুতবা আর সেই করুণ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেইনি, আজ অবধি নয়! বেমালুম ভুলে গেছি, ভুলে গিয়ে আছিও বেশ!

এখন অপেক্ষা কেবল সেই ভয়াবহ সময়টুকুর, কখন আল্লাহর আজাব আচমকা এসে ঘেরাও করবে আর আমাদেরকেও সেদিনকার সেই দিল্লিবাসীর মত এক কলঙ্কিত ও ভয়াবহ ইতিহাসের অংশ বানিয়ে রেখে যাবে আগামী প্রজন্মের জন্য, একটা ঐতিহাসিক উদাহরণ হিসেবে! অপেক্ষা কেবল সময়ের!!

www.pathagar.com

নিরাপদ নারীত্বেই সভ্যতা নিরাপদ!

ঘটনা সেই ৭১১ খ্রিষ্টাব্দের। রাজা রডারিক কর্তৃক জুলিয়ান কন্যা ষোড়শী ফ্লোরিন্ডার শ্লীলতাহানি হলে ক্ষুব্ধ পিতা কাউন্ট জুলিয়ান দিশেহারা হয়ে নিজ বন্ধু কর্তৃক এই চরম অপমানের প্রতিশোধ নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। রাজশক্তির অতি কাছের মানুষ জুলিয়ান এতদিনে উপলব্ধি করেন, তিনি নিজে সমাজে অত্যন্ত প্রভাবশালী, সচ্ছল এবং নেতৃস্থানীয় একজন। তার এই সম্মান, এই প্রভাব প্রতিপত্তি আর সচ্ছলতা আদরের কন্যা ফ্লোরিন্ডার ইজ্জতের নিরাপত্তা দিতে পারেনি, তা হলে এই স্প্যানিশ সমাজের কোটি কোটি মানুষ, যাদের না আছে রাজশক্তি আর না আছে ক্ষমতা, না আছে সামাজিক প্রভাব, আর না আছে আর্থিক সচ্ছলতা তাদের অবস্থাটা কি? তাদের স্ত্রী কন্যাদের নিরাপত্তা কে দেবে? তারা কিভাবে নিজেদের মান-সম্মান আর ইজ্জত নিয়ে বেঁচে থাকবে?

নিজ কন্যা ফ্লোরিন্ডার অপমানিতা হওয়ার কথা জানার পর থেকে কাউন্ট জুলিয়ান আর রাতে ঘুমোতে পারেন না। আদরের কন্যার ইজ্জতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ একজন পিতা হিসেবে বেঁচে থাকার আর কোন মানে হয় না। এরকম অনেক চিন্তা তার মাথায় আসে, কিন্তু তার পরেই আবার তিনি ভাবেন, তিনি যদি আত্মহত্যা করেন, তা হলে তার মা-মরা মেয়েটার তো আর কেউই থাকলো এই দুনিয়ায়? সেই মেয়েটা তা হলে কার মুখের দিকে চেয়ে বেঁচে থাকবে?

বৃদ্ধ জুলিয়ানের চোখ দুটো ভিজে আসে। ঠোঁট জোড়া আবেগে কেঁপে উঠে, ক্রোধ আর আক্রোশে বুকের ভেতর থেকে তপ্ত লাভার মত গরম বাতাসের একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে যায় নিজের অজান্তেই! না, তাকে কিছু একটা করতেই হবে। তিনি তার নিজের মেয়েসহ এ ভূ-খণ্ডের লক্ষ লক্ষ যুবতীকে এক নরপশুর লোভাতুর শিকার হতে দিতে পারেন না।

এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর পরামর্শে কাউন্ট জুলিয়ান মেয়েকে অতি বিশ্বস্ত এক আত্মীয়ার কাছে রেখে সমুদ্র পাড়ি দিলেন, ওপারের মরক্কোয়, সেখান থেকে তাদের অতি সম্মানের সাথে পাঠানো হলো কায়রোয় উমাইয়া গভর্নর মুসা ইবনে নুসাইর এর কাছে। মুসা সব শুনে বিস্তারিত জানিয়ে দূত পাঠালেন দামেশক-এ খলিফা ওয়ালিদ ইবনে মালেক-এর কাছে করণীয় জানতে চেয়ে। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই দামেশকে খলিফার অফিস থেকে করণীয় হিসেবে নির্দেশ এসে পৌঁছল কায়রোয়।

মিশর তথা কায়রোর নির্দেশে মরক্কো থেকে তরুণ সেনাপতি তারিক বিন

www.pathagar.com

যিয়াদকে পাঠানো হলো স্পেন অভিযানে ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে। প্রথম দিকে এ অভিযানের লক্ষ্য ছিল একটাই, কাউন্ট জুলিয়ানের কন্যার অপমানের প্রতিশোধ নেয়া আর রডারিকের লোলুপ দৃষ্টি থেকে স্পেনের মেয়েদের ইজ্জত, তাদের মান-সম্মান আর সম্ভ্রমকে রক্ষা করা।

সেই যে শুরু, এরপরে একাধারে চল্লিশ বৎসর ধরে চলে এ অভিযান। ৭৫২ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ আটলান্টিকের কোল ঘেঁষে কিছু পাহাড়ি অঞ্চল ছাড়া পুরো পেনিনসুলা (বর্তমান স্পেন ও পর্তুগাল) ইসলামের ছায়াতলে চলে আসে। শুরু হয় ইতিহাসের এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়; আল আন্দালুসিয়া। সময়কালটা খেয়াল করেছেন তো ঠিক মতো? ৭১১ খ্রিষ্টাব্দ।

ঠিক এই একই বৎসরে, অর্থাৎ এই ৭১১ খ্রিষ্টাব্দেই মিশর, মরক্কো, স্পেন এ অঞ্চলের ঠিক উল্টো দিকে আর এক দল নির্যাতিতা নারীর চিৎকার ভেসে এসেছিল।

স্বর্ণদ্বীপ (বর্তমান শ্রীলংকা) থেকে নৌকা বোঝাই একদল আরব মুসলমান যাচ্ছিল জেদ্দা, সেখান থেকে তাদের গন্তব্য ছিল দামেশক। পথিমধ্যে বর্তমান করাচির সন্নিকটে দেবল বন্দরের কাছে এই নৌকা লুট করে জলদস্যুরা। যাত্রীদের সকল মালপত্র লুট করে নিয়ে দস্যুরা নারীদেরকে ছিনিয়ে নেয়, কয়েকজন নারীকে নিজেদের কাছে রাখলেও বেশ ক'জন নারীকে সিন্ধুর শেষ হিন্দু রাজা দাহিরকে উপঢৌকন হিসেবে দেয়। রাজা দাহির আরব নারীর লোভ সামাল দিতে না পেরে সে উপঢৌকন গ্রহণ করেন সহাস্য বদনে!

উমাইয়া খেলাফতের গভর্নর হিসেবে ইরাকে তখন নিয়োগ পেয়েছেন চরম অত্যাচারী ও রক্তপিয়াসী বলে পরিচিত হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। যারা ইতিহাসের কিছুটা খবরাখবর রাখেন, তারা জানেন মুসলমানদের কাছে কতটা ঘৃণিত ছিলেন চার চারজন সম্মানিত সাহাবীর (আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা:), যাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:), সাঈদ ইবনে যুবাইর (রা:) এবং কামিল ইবনে যিয়াদ (রা:) হত্যাকারী এই হাজ্জাজ বিন ইউসুফ।

এতটা নৃশংস হওয়া সত্ত্বেও কয়েকজন নারীর অসম্মানের খবর শুনে হাজ্জাজ রাজা দাহিরের কাছে দূত পাঠিয়ে সেই নারীদের ফেরত চাইলেন এবং অপরাধীদের শাস্তিবিধানের কথা বললেন। কিন্তু চরম দাম্ভিক রাজা দাহির সে কথায় কর্ণপাত না করায় হাজ্জাজ মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে একটা সেনাদল পাঠালেন।

হাজ্জাজ কর্তৃক সেনাদল পাঠানোর খবর পেয়ে রাজা দাহির কতটা দম্ভের সাথে তাদের মোকাবেলার কথা ঘোষণা করেছিলেন, সে বর্ণনা ঐতিহাসিক

www.pathagar.com

গ্রন্থ 'চাচনামা' আমাদের বিস্তারিত ভাবেই দিয়েছে। তার সে দম্ভ যে কোনো কাজেই আসেনি, তার প্রমাণতো রাজা দাহিরকে দিতে হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের কর্তিত মস্তকখানা দিয়ে!

কেবলই কি তাই? পুরো ভারতীয় সমাজকেই এ অপরাধের মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছে নিজেদের স্বাধীনতা হারিয়ে। ঠিক যেমনটি মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছিল স্পেনের অত্যাচারী সম্রাট রডারিককে নিজ প্রাণ ও রাজ্য হারিয়ে! এর পরে যা হয়েছে, সেটা ইতিহাস। সে ইতিহাস পুরো বিশ্বের প্রতিটি নাগরিকই জানেন।

ইতিহাসটা আমরা জানি বটে, কিন্তু ইতিহাসের মধ্যে যে শিক্ষাটা লুকিয়ে আছে, সেটা কি লক্ষ্য করেছি আমরা? একটু খেয়াল করে যদি দেখি, তবে ঠিকই দেখতে পাবো, যখন কোনো সমাজে নারী নির্যাতনের শিকার হয় তখন সে সমাজের ভিত নড়বড়ে হয়ে পড়ে। আর যদি ঐ নির্যাতিতা নারীর প্রতি কৃত নির্যাতন ও অবিচারের প্রতিবিধান না করা হয়, তা হলে সে সমাজটা পুরোপুরিই ধসে পড়ে। সে সমাজে প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের হাত থেকে ফসকে যায় তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব। আর যারা ঐসব হতভাগিনী নির্যাতিতা নারীদের মুক্তিতে এগিয়ে আসেন, তাদের হাতেই গিয়ে পড়ে সমাজের নেতৃত্ব ও পরিচালনার দায়িত্ব।

সৃষ্টির সূতিকাগার, মৌলিক কারখানা হলেন একজন নারী, তিনি যতক্ষণ নিরাপদ থাকেন সমাজ ততক্ষণ নিরাপদ থাকে। আর নারী যখন ভূলুণ্ঠিতা হন, তখন ভূলুণ্ঠিত হয় পুরো সমাজ, পুরো রাষ্ট্র আর পুরো সভ্যতাই! নারীর গর্ভে জন্ম নেয়া এ সমাজের কোটি কোটি বীর মরদরা কি সে সত্যটা অনুধাবন করবে না?

www.pathagar.com

পচা পান্তায় লর্ড হেস্টিংসের ডিনার

ঘটনাটা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হারানোর প্রক্রিয়াকালীন, সেই ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের। পলাশীর চূড়ান্ত যুদ্ধের মাত্র কয়েক মাস আগেকার ঘটনা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক নবাব ও তার প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে যথেচ্ছাভাবে ব্যবসা পরিচালনা, অস্ত্রসংগ্রহ ও দুর্গ নির্মাণ, কর ফাঁকি দেয়াসহ অবৈধ ব্যবসা এবং নানান রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালনার কারণে নবাব আলিবর্দী খান তাদেরকে বার বার সতর্ক করে দেয়ার পরেও তারা নবাবের নির্দেশকে আমলে নেয়নি, বরং উল্টো নবাবের মনোনীত উত্তরসূরির বিরোধিতাকারীদের (মীর জাফর, ঘষেটি বেগম, রায়বল্লভ গং) সাথে সখ্যতা গড়ে তোলে, এর মাধ্যমে তারা প্রকারান্তরে স্বাধীন বাংলার রাজনীতিতে নাক গলায়।

এরই মধ্যে তারা কাশীমবাজার কুঠিতে প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদের মজুদও গড়ে তোলে। পরবর্তীতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেয়া তথ্য মতে দেখা যায় যে, নবাব আলিবর্দী খানের মনোনীত উত্তরসূরি সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজবিদ্বেষী মনোভাব পোষণ করতেন এবং তিনি ক্ষমতায় এলে কোম্পানির ব্যবসায়ীক স্বার্থ ও ক্ষমতা খর্ব করবেন, এমন খবর তাদের কাছে ছিল, এরকম সংবাদ থাকার কারণেই তারা নবাব সিরাজের ক্ষমতারোহণের বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

যাই হোক, ১৭৫৬ সালের এপ্রিল মাসে নবাব আলিবর্দী খান ইন্তেকাল করেন, সিরাজ বাংলার নবাব হয়ে ইতোমধ্যেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়া স্বাধীনতাকে সংহত করতে বিদেশি বেনিয়া ইংরেজদেরকে রাষ্ট্রের অনুগত করতে তৎপর হন। কোম্পানির কাশিমবাজার দুর্গ অবরোধ করেন। বহু ইংরেজ সৈন্য বন্দী হলেও কোম্পানির পক্ষ থেকে পরিচালিত ষড়যন্ত্রের অন্যতম কুশীলব ওয়ারেন হেস্টিংস পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাওয়া হেস্টিংস কুঠির পাশেই একটা মুদির দোকানে আশ্রয় নেয়। উক্ত দোকান মালিক মুদিখানা দোকান করার পাশাপাশি আট টাকা মাসিক বেতনে কোম্পানির একজন কর্মচারী ছিল, কৃষ্ণকান্ত নন্দী নাম হলেও কান্তমুদি নামেই সকলেই চিনতো। কোম্পানির ফুটফরমায়েশের চাকরি করার কারণে হেস্টিংসও তাকে চিনতো।

বাংলার নবাব যখন স্বাধীনতা সংহত করতে ব্যস্ত, সেই তখন তারই এক প্রজা, বঙ্গবাসী এই কান্তমুদি হেস্টিংসকে আশ্রয় দিয়ে গোপনে রক্ষা করে। জুলাই, আগস্ট মাসের প্রচণ্ড ভ্যাপসা গরমের সেই দিন প্রাণভয়ে ভীত,

www.pathagar.com

ক্ষুধার্ত হেস্টিংস-এর রাতের ডিনারের আয়োজন করেছিল। ডিনারের মেনু ছিল, রাতের খাবারের পর পরের দিন পান্তা খাবার জন্য ভাতের ভেতরে পানি দিয়ে রাখা ভাত, কাঁচা মরিচ, বড়ি পোড়া আর চিংড়ি মাছের তরকারি, ওগুলোই লবণ দিয়ে একটা কলাপাতা কেটে এনে তাতে পরিবেশন করা হয়। হেস্টিংস গ্রোগ্রাসে ডিনার খেয়ে সেখানেই গরুর গোয়ালে রাত্রি যাপন করে পালিয়ে থাকে।

এর পরে দু'টি দশক না যেতেই ১৭৭৪ সাল নাগাদ এই হেস্টিংস-ই বাংলার নবাব। কান্তমুদির অবাধ যাতায়াত হেস্টিংস এর দরবারে। এখন সে আর কান্তমুদি নয়; 'কান্ত বাবু'। বাংলার নবাব হেস্টিংস এর বিশেষ প্রিয়ভাজন হবার সুবাদে এই মুদি দোকানদার জমিদারি থেকে শুরু করে লবণের ইজারাদারি বাগিয়ে নেয়। রাতারাতি কোটিপতি হয়ে উঠে সে। কাশিমবাজার জমিদারির প্রতিষ্ঠাতাও সে! (সূত্রঃ Warren Hastings in Lower Bengal, Calcutta Review)

বেনারসের রাজা চৈতসিংহ এবং তার রানী, মুর্শিদাবাদের মনি বেগম ও অযোধ্যার রানীদের উপরে অত্যাচার করে বার বার তাদের কাছ থেকে হেস্টিংসের এর জন্য অর্থ আদায় ও তাতে ভাগ বসানোর মাধ্যমে কান্তমুদি হেস্টিংসের জন্য আয়োজন করা সেই ডিনারের দাম উসুল করে নেয়। কান্তমুদি কতটা বিত্তের মালিক হয়েছিল সেটা জানতে ও বুঝতে হলে কেবল এটা জানাই যথেষ্ট যে, সে তার মায়ের শ্রাদ্ধ করতে সে যুগে প্রায় কুঁড়ি লাখ টাকা খরচ করেছিল।

সত্যিই, হেস্টিংস-এর জন্য পচা বাসি পান্তা ভাতের ডিনার। আর দাম? বাংলার স্বাধীনতা! দামটা একটু বেশিই ছিল বৈকি!!

www.pathagar.com

এনাফ ইজ এনাফ, আর নয়

স্থান গোলকুন্ডা (বর্তমান হায়দ্রাবাদ, ভারতের কসমোপলিটন শহর)। ঘটনা সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ, সেই ১৬৫২ খ্রিষ্টব্দের গ্রীষ্মকালের এক দুপুর। গোলকুন্ডার মুসলিম রাজার প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতি মীর জুমলা তার অফিসে বসে ব্যস্ত সময় পার করছেন। তার সামনে সারিবদ্ধভাবে অত্যন্ত সম্মান ও তাজিমের সাথে বসে আছে বিভিন্ন অধস্তন কর্মচারীরা, তাদের হাতে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত রিপোর্ট, চিঠি আর হিসাবপত্র।

মীর জুমলা এক এক করে তাদের হাত থেকে সেগুলো নিচ্ছেন, ভালো করে পড়ে দেখছেন আর প্রয়োজনে নোট দিচ্ছেন বা দস্তখত দিচ্ছেন অথবা করণীয় বলে দিচ্ছেন। কথা বা কাজ শেষে সামনে উপবিষ্টজন উঠে গেলে তার পেছনের জন এগিয়ে যাচ্ছে, মীর জুমলার হাতে তার রিপোর্ট বা হিসাব দিচ্ছে আর তিনি আবারও সেই আগের জনের মতই তা দেখে দিচ্ছেন। এভাবেই দীর্ঘক্ষণ চলে আসছে।

ঘটনার বিস্তারিত বলার আগে একটা কথা বলে নেই। মীর জুমলাকে আমরা বাংলাদেশিরা খুব ভালো করেই জানি ও চিনি। কারণ এই মীর জুমলাই পরবর্তীতে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজবের অধীনে চাকরি নেন এবং নিজ যোগ্যতা ও দক্ষতায় তার আস্থা অর্জন করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাকে বাংলার শাসক; সুবাদার হিসেবে নিয়োগ করেন। তিনি বাংলায় অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ অবাকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন ঘটান। মগ দস্যুদের উপদ্রবকে নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান আসাম ও মেঘালয় পর্যন্ত।

পারস্যের ইস্পাহানে ১৫৯১ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম নেয়া শিয়া মতাদর্শী মীর জুমলা রত্ন ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে ভাগ্যের সন্ধানে আসেন ভারতে। হীরা-মণি-মুক্তা সহ বিভিন্ন দুস্প্রাপ্য রত্নের একমাত্র বাজার ছিল ভারত। পর্তুগিজ, ইংল্যান্ড, ফরাসি ও স্প্যানিশসহ ইরানি রত্নব্যবসায়ীরা তখন দলে দলে ভারতমুখী। মীর জুমলাও ছিলেন তাদেরই একজন।

ভারতে এসে বিশ্বের সবচেয়ে বড় এবং একমাত্র হীরার খনি সমৃদ্ধ নগরী গোলকুন্ডায় তিনি আসন গাড়েন। অত্যন্ত দক্ষ প্রশাসক ছিলেন তিনি, সৈনিক হিসেবেও ছিলেন চৌকস। অল্পদিনেই রাজদরবারে ঠাঁই করে নেন, এব শনৈ শনৈ উন্নতি করে একেবারে প্রধানমন্ত্রী বনে যান।

ভাগ্যের সন্ধানে যিনি নিজের জন্মস্থান ইস্পাহান ছেড়েছেন, সেই তিনি ভাগ্য সুপ্রসন্ন দেখে গোলকুন্ডার রাজাকে পরিত্যাগ করে আরও উন্নত সুযোগ

www.pathagar.com

সুবিধার বিনিময়ে গিয়ে ভিড়েছেন মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের দরবারে। তারই এক পর্যায়ে এই বাংলার গভর্নর হয়েছিলেন। নিজ জন্মস্থানে শেষ পর্যন্ত আর ফেরা হয়নি। বর্তমান ভারতের মেঘালয়েই তার জীবনাবসান হয়।

যা হোক, মীর জুমলা যতক্ষণ দাপ্তরিক কাজে ব্যস্ত ছিলেন ততক্ষণই ঘরের এক কোণে বসে বসে পুরো বিষয়টা বড় উৎসাহ নিয়ে দেখছে ভারতে বেড়াতে আসা ফরাসি পরিব্রাজক ও রত্ন ব্যবসায়ী; Jean Baptiste Tavernier মীর জুমলার অতিথি। মীর জুমলার মত তার এই বিদেশি অতিথিও ক্ষুধার্ত, দুপুরের খাবার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। পেটের ভেতরটা সে কথাই জানান দিতে শুরু করেছে। আর গোটা দুই কর্মচারী ও দর্শনার্থীর বিষয় ফয়সালা করতে পারলেই তিনি ও তার দলবল আজকের মত উঠতে পারেন।

এরই মধ্যে ঘটলো আর এক বিপত্তি। তার পুলিশ প্রধান চারজন কয়েদিকে এনেছে, প্রহরীদের প্রহরায় তাদের দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখে ভেতরে এসে সে মীর জুমলাকে কুর্নিশ করে সে কথাই জানালো। মীর একবার মাত্র চোখ তুলে সেই পুলিশ প্রধানের কথা শুনলেন মাত্র। এর পরে কোনো কথা না বলে আবার নিজের কাজে মন দিলেন। সেই জেনারেল একটু পেছনে সে এসে দেয়াল ঘেঁষে ঠাঁই দাঁড়িয়ে রইলো। হাতের চিঠিটা পড়া শেষ করে তিনি নির্দেশ দিলেন কয়েদিদের ভেতরে আনতে, নির্দেশ পেয়ে চারজনকেই আনা হলো শেকল পরাবস্থায়।

মীর জুমলা এক এক করে প্রত্যেকজন কয়েদির দিকে খুব ভালো করে গভীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলেন। সে দৃষ্টির গভীরতা এমনই ছিল যে, তার দিকে কয়েদিরা চোখ তুলে একটাবার তাকাবার সাহসও করতো পারলো না। তাদের বিরদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ শুনে নিয়ে তিনি ভরা মজলিশেই এক এক করে প্রত্যেক কয়েদিকে জেরা করলেন, একের পর এক প্রশ্ন ও পাল্টা প্রশ্ন করে নাস্তানাবুদ করলেন। রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী মহাশক্তিধর মীর জুমলার সামনে নিজেদের কণ্ঠের স্বাভাবিকতাও ধরে রাখতে পারলো না। নিজ নিজ অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে মহামান্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো।

মীর জুমলা শুনলেন সব। এর পরে তার নজর ফেরালেন কিছু কাগজ ও হিসেবপত্র নিয়ে বসে থাকা শেষ কর্মকর্তার দিকে। বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হিসেবটা দেখা শেষ করে তাতে নিজের স্বাক্ষর করে দিলেন কিছু নির্দেশনাও দিলেন। এর পরে মুখ ফেরালেন এতক্ষণ নতশিরে দাঁড়িয়ে

www.pathagar.com

থাকা সেই চার কয়েদির দিকে। তার সেই পুলিশ প্রধানের দিকেও চাইলেন।

মীর জুমলা তার রায় দেবেন বুঝতে পেরে পুলিশ প্রধান এক কদম এগিয়ে গিয়ে বড় তাজিমের সাথে দাঁড়ালেন এবং মনোযোগের সাথে চেয়ে রইলেন। মীর জুমলা মুখ খুললেন। তিনি এক একজন কয়েদির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তার রায় দিলেন। ঐ ব্যাটার এক হাত আর এক পা কেটে উন্মুক্ত মাঠে রোদের মধ্যে ফেলে রাখো। এরপরের জনের দিকে রায় দিলেন, ওর পেট চিরে ফেলা হোক, এরপরে তাকে নর্দমার মধ্যে ফেলে রাখা হোক। আর থাকলো দুই জন, সে দু'জনের দিকে চেয়ে নির্দেশ দিলেন; শিরশ্ছেদে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হোক।

অনেক দেরি হয়ে গেছে, দুপুরের খাবারের সময় প্রায় পার হয়ে যাচ্ছে। বিদেশি অতিথিকে বসিয়ে রেখেছেন! তাড়াতাড়ি উঠলেন। প্রধানমন্ত্রী, তার সভাসদ ও বিদেশি মেহমানদের দস্তরখানায় যখন জগদ্বিখ্যাত হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানি পরিবেশন করা হচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে প্রাসাদের বাইরে থেকে হাত পা কাটা কিংবা পেট চেরা হতভাগ্যদের আর্তচিৎকার ভেসে আসছিল। তবে তাতে বিরিয়ানির স্বাদে কোনো ধরনের পরিবর্তন হয়েছিল কি না, সে কথা অবশ্য জানা যায়নি।

পুনশ্চ বলে রাখি; কোনো প্রাতিষ্ঠানিক আদালত ও কাজী বা বিচারকবিহীন এ বিচারকে আপনি হায়দ্রাবাদি কিংবা ইস্পাহানি, ভারতীয় বা ইরানি বিচার বা অন্য কোনো বিচার বলুন, আল্লাহর ওয়াস্তে ইহাকে ইসলামি বিচারের নজির বলবেন না। কারণ, যে পদ্ধতিতে বিচার করা হয়েছে, যে উদাসীনতা ও নিস্পৃহতার সাথে রায় ঘোষণা করা হয়েছে এবং যে বর্বরতার সাথে তা কার্যকর করা হয়েছে, তার সাথে আর যারই সম্পর্ক থাকুক না কেন, অন্তত এটা বুঝে নিন যে, ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলাম অনেক মিথ্যা অপবাদ সয়েছে। এনাফ ইজ এনাফ, আর নয়-

www.pathagar.com

যে আগুন নীরবে জ্বলে

ইউসুফ, ছেলেটা অলুক্ষুণে! অন্তত ছেলেটার নিজ জন্মদাতা পিতার মতে। তার জন্মই নাকি পুরো পরিবারের উপরে এক কষ্টকর দুঃসহ সময় টেনে এনেছে। বাবা নাজিমুদ্দিন ছিলেন তিকরিতের এক দুর্গের অধিপতি। সৈনিক হিসেবে তার অভিজ্ঞতা, সাহস ও নিষ্ঠা সব সময়ই মুসলিম শাসকদের নজর কেড়েছে অতি সহজেই। তাকে নিজেদের দলে নিতে, তার হাতে ছোটখাটো একটা সৈন্য বাহিনীর ভার তুলে দিতে মুসলিম খলিফা ও বাদশাহরা কখনও দ্বিধায় ভোগেননি। সেই তাকেই কিনা আজ এভাবে রাতারাতি প্রাণ হাতে করে পরিবার-পরিজন নিয়ে রাতের আঁধারে পালিয়ে বাঁচতে হচ্ছে!

তার নিজের তো কোন অপরাধ তিনি দেখছেন না, তার পরেও তাকে শাস্তি নিতে হচ্ছে, এটা কপালেরই ফের! আর কপালে এই দুর্গতির জন্যই তিনি সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুসন্তান ইউসুফকেই দুষছেন! এই ছেলেটা জন্মেই তার কপালে এই দুর্গতি টেনে এনেছে!

তিনি মহাসুখেই ছিলেন বাগদাদের গভর্নরের বদান্যতায়। সাহস ও দক্ষতার স্বীকৃতি হিসেবে তাকে তিকরিতের একটা দুর্গাধিকারী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন তিনি, অধীনে মোটামুটি মাঝারি মাপের এক সৈন্যবাহিনী। সব মিলিয়ে তার প্রভাব প্রতিপত্তি, সম্মান ও সচ্ছলতা কোনটারই ঘাটতি ছিল না। কিন্তু এ অবস্থাটা হঠাৎ করেই পাল্টে গেল।

দুর্গের অধস্তন এক অফিসার আর এক সৈনিকের স্ত্রীর শ্লীলতাহানি করলে নাজিমুদ্দীনের ভাই আসাদউদ্দীন শিরকুহ উক্ত অফিসারকে হত্যা করেন। ঘটনাক্রমে নিহত অফিসারটি ছিল একজন আরব ও বাগদাদের গভর্নরের খুব কাছের মানুষ, আর নাজিমউদ্দীন ও তার ভাই আসাদউদ্দীন অনারব, কুর্দি বংশোদ্ভূত। বাগদাদে এ ঘটনার রিপোর্ট গেলে গভর্নর সোজা সাপ্টা নাজিমউদ্দিনকে বরখাস্ত করলেন, কেবল যে বরখাস্ত করলেন তাই নয়, তিনি তাকে সপরিবারে তার রাজ্য তিরকিত ছাড়তে বললেন।

এ নির্দেশ যেদিন তিনি পেলেন, ঠিক সে দিনই নাজিমুদ্দীনের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। নবজাতক সন্তান ও তার অসুস্থ মা এরকম একটা সময়ে দীর্ঘ সফরের উপযুক্ত নয়, তার পরেও নির্দেশ পেয়ে তার নিজের ও ভাই আসাদউদ্দীনের পুরো পরিবারসহ তারা তিকরিত ছাড়লেন। তাদের ভয় ছিল, গভর্নর যে কোনো সময় তার নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে উক্ত সৈনিককে হত্যার কারণে ভাইসহ তাকে বিচারের মুখোমুখি করে আরও বড় শাস্তি দিতে পারেন। এই ভয়েই নাজিমউদ্দীন তড়িঘড়ি করে প্রাণ নিয়ে পথে নামলেন।

www.pathagar.com

পথে নামলেন বটে, কিন্তু যাবেন কোথায় মনে পড়লো এক পুরনো বন্ধুর কথা। অনেক দিন আগে ইমাদুদ্দিনকে বিপদের মুহূর্তে আশ্রয় দিয়েছিল, তার প্রাণ বাঁচাতে সাহায্য করেছিল সেই বন্ধু ইমাদুদ্দিন আজ অনেক বড় পদে কর্মরত, মসুলের গভর্নর, একজন আলেম হিসেবে তার নাম ডাক ছিল আগে থেকেই, তার উপরে একজন সাহসী সেনাপতি ও একজন সৎ প্রশাসক হিসেবে তার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। নাজিমুদ্দিন পরিবার নিয়ে সেদিকেই যাত্রা করলেন।

মাত্র একদিন বয়সী সন্তান ইউসুফ আর আর মা সদ্য সন্তান প্রসবজনিত কারণে অসুস্থা জননী যাত্রাপথে পাহাড় ও মরুভূমির বন্ধুর, দুর্গম ও বৈরী পরিবেশে প্রসূতি ও নবজাতকের পরিচর্যা নেয়ার জন্য থামতে হচ্ছিল যা তাদের যাত্রাকে বার বার দীর্ঘায়িত করছিল, সে কারণে নাজিমুদ্দীন অত্যন্ত বিরক্ত ও অস্থির হয়ে পড়ছিলেন। আর এসবের কারণে তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ছিল শিশুসন্তান ইউসুফের উপরে; এই ব্যাটাই সমস্ত দুর্ভাগ্যের কারণ!

নাজিমুদ্দীনের এক ভৃত্য ছিল, প্রবীণ ও খুব বিশ্বস্ত, জ্ঞানী এবং প্রাজ্ঞও বটে। মনিবের এ হেন মানসিক পরিস্থিতি দেখে সেই ভৃত্য এগিয়ে এসে বললো, হুজুর, এই মাসুম বাচ্চা, যে কিনা নিজের ভালো মন্দই নির্ধারণ করতে পারে না, সেই ছেলেটাই আপনার মত এমন এক দক্ষ, বীর সেনাপতির ভাগ্যের ভালো মন্দ নির্ধারণ করে দিয়েছে? আপনি কি তাই বিশ্বাস করেন? হুজুর, এই বৈরী সময়ে নিজের মাথা ঠাণ্ডা রাখুন, নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করবেন না, আমি বলে রাখলাম আজকের এই কষ্টকর সময় আপনার থাকবে না।

পুরনো ভৃত্যের কথা শুনে নাজিমুদ্দিনের সম্বিত ফিরে আসলো যেন। চোখ দুটো ভিজে এলো। ভাবলো সে নিজে কি জানে না যে, এই মাসুম বাচ্চার কোনো হাত নেই তার আজকের এই দুর্ভাগ্যের পেছনে! কিন্তু কি করবে? মন যে মানে না। হতাশা থেকে কত কিছুই না বলে ফেলে! মনে মনে অনুতপ্ত হতে থাকে।

দীর্ঘ কয়েকদিন পথ চলার পরে নাজিমুদ্দীন সপরিবারে গিয়ে উঠে মসুলে। পুরনো বন্ধুকে পেয়ে মসুলের গভর্নর ইমামুদ্দিন যারপরনাই খুশি মনে তাকে গ্রহণ করেন। একদিন এই লোকটাই তার জীবন বাঁচাতে সাহায্য করেছিল আশ্রয়, খাদ্য আর নিরাপত্তা দিয়ে! আজ সে নিজেই কিনা আশ্রয়হীন!

সুলতান ইমামুদ্দীন যে কেবল নাজিমুদ্দীনকে আশ্রয় দেন তাই নয়, তিনি একজন দক্ষ সৈনিক ও জেনারেল হিসেবে নাজিমুদ্দিনকে জানতেন, তাই

www.pathagar.com

তাকে নিজের সেনাবহিনীতে জেনারেল হিসেবে নিয়োগও দেন। এভাবেই পিতার সাথে সাথে শিশু ইউসুফও নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে যায়। সুলতান ইমামুদ্দিন নিজে ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান আলেম ও ন্যায়পরায়ণ শাসক। তার দুই ছেলে সাইফুদ্দিন ও নুরুদ্দিন। ছোট ছেলে নুরুদ্দিনের বয়স তখন প্রায় কুড়ি বৎসর।

বাবা ইমামুদ্দিনের মত নুরুদ্দিনও যে কেবল যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী, ঘোড়সওয়ার হিসেবে তুখোড়, তলোয়ার চালনায় অতি দক্ষ এবং তীরন্দাজ হিসেবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন মসুলের একজন বিখ্যাত আলেমও বটে। নিরন্তর জ্ঞানচর্চা ছিল তার অভ্যাস, কুরআনের হাফেজ ছিলেন তিনি, সেই সাথে ছিলেন হাদিসশাস্ত্রেও অভিজ্ঞ একজন। পুরো মসুলে (এবং পরবর্তীতে সিরিয়ায়) শত শত স্কুল, মাদ্রাসা, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। সমাজে ছেলে-বুড়ো থেকে শুরু করে নারী-পুরুষ সকলকে তিনি জ্ঞানার্জনে উৎসাহ দিতেন, সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

এর পাশাপাশি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, নুরুদ্দিন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও আল্লাহভীরু লোক ছিলেন। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক কাজের মাঝেও সুযোগ পেলেই তিনি সারাক্ষণ কুরআন তেলওয়াত করতেন, হাদিস চর্চা করতেন। তার ছিল এক বিরাট লাইব্রেরি। ব্যক্তিগত কালেকশন ছিল বিশাল। মসুল, দামেশক ও ফিলিস্তিনের সব বিখ্যাত জ্ঞানী আলেমদের সাথে ছিল তার সখ্যতা। সুলতান ইমামুদ্দিন কিংবা তদীয় পুত্র নুরুদ্দিন, সকলের পারিবারিক পরিবেশই ছিল পুরোপুরি ইসলামিক পরিবেশ।

সময়কালটা বিবেচনা করাটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিশু ইউসুফ পিতা ও পরিবারের সাথে যখন মসুলে এসে আশ্রয় নেয়, সেটা ছিল ১১৩৮ খ্রিষ্টাব্দ। এর মাত্র চল্লিশ বৎসর আগে ইউরোপের খ্রিষ্টানগণ কর্তৃক পোপ দ্বিতীয় আরবানের নির্দেশ ও আহ্বানে পবিত্রভূমি জেরুজালেম তথা বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করেছে প্রথম ক্রুসেডের মাধ্যমে। এ যুদ্ধে ইউরোপের খ্রিষ্টানরা মানবেতিহাসের সবচেয়ে বর্বর ও জঘন্যতম নৃশংসতা চালিয়েছে। তারা লক্ষ লক্ষ মানবসন্তানকে হত্যা করেছে। এমনকি, জেরুজালেম ও আশপাশে বসবাসরত আরব খ্রিষ্টানদেরকেও বাদ দেয়নি। খুন, হত্যা, ধর্ষণ, লুট ছিল অকল্পনীয়, অচিন্ত্যনীয় মাত্রার!

গর্ভবতী নারীর পেট চিরে গর্ভস্থ শিশুকে বের করে ছুঁড়ে ফেলেছে! মায়ের কোল থেকে শিশুসন্তানকে কেঁড়ে নিয়ে দেয়ালের সাথে তার মাথা আছড়ে আছড়ে হত্যা করেছে বাবা মায়ের সামনেই। এমনকি, সেই সব শিশুকে

www.pathagar.com

ফুটন্ত পানিতে সেদ্ধ করে খেয়েছে! এ ঘটনার চাক্ষুষ বর্ণনা দিয়েছে যুদ্ধে অংশ নেয়া খ্রিষ্টান পাদ্রিদেরই কেউ কেউ।

প্রথম ক্রুসেডে অংশ নেয়া পাদ্রি; Fulcher (১০৫৯-১১২৮) যিনি 'Fulcher of Chartres' নামেই অধিক পরিচিত, তার লিখিত ক্রুসেডের বিবরণী দিতে গিয়ে নিজের দেখা ঘটনা লিখেছেন;

I shudder to tell that many of our people, harassed by the madness of excessive hunger, cut pieces from the buttocks of the Saracens alreadz dead there, which they cooked, but when it was not yet roasted enough by the fire, they devoured it with savage mouth. (সূত্র: Edward Peters, The First Crusade: The Chronicle of Fulcher of Chartres and Other Source Materials, University of Pennsylvania Press, ১৯৯৮, পৃ: ৮৪)

ভাবানুবাদ: অত্যন্ত ঘৃণার সাথেই বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমাদের অনেক সৈনিকই ক্ষুধায় কাতর হয়ে মুসলমানদের মৃতদেহের পশ্চাৎদেশ থেকে মাংস কেটে এনে তা রান্না করেছে, অনেকে তো আবার তা ঠিকমত সেদ্ধ না হতেই মুখ দিয়ে কেটে কেটে খেয়েছে!

Radulph of Caen নামের অন্য এক প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিক উক্ত ঘটনার নয় বৎসর পরে ১১০৭ সালে লিখেছেন;

Some people said that, constrained by the lack of food, they boiled pagan adults in cooking-pots, impaled children on spits and devoured them grilled.

কিছু লোক বর্ণনা করেছে, ক্ষুধার জ্বালায় তারা মুসলমানদের বড় ডেকচিতে সেদ্ধ করে এবং বাচ্চাদের কেটে সে মাংস পুড়িয়ে খেয়েছে!

খ্রিষ্টানদের অন্য একটি সূত্র হতেও আমরা এ তথ্য পাই (সূত্র: Chronicles of the Crusades, Eye witness accounts of the wars between Christianity and Islam. Elizabeth Hallam, পৃ: ৮৫)।

এরকম বর্বরতার প্রত্যক্ষদর্শী ও এ বর্বরতার শিকার বা এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত অনেক মুসলমান তখনও জীবিত ছিলেন। ছয় বৎসর বয়সের শিশু ইউসুফ মসুলে নুরুদ্দিনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষাগ্রহণ করছে, হাদিসশাস্ত্র পড়ছে, কুরআন হেফজ করছে তখন সে তার শিক্ষক নুরুদ্দিনের মুখে যেমন এরকম বর্বরতার কথা শুনেছে, তেমনি শুনেছে খেলার সাথী বন্ধু-বান্ধবদের মুখেও। পুরো মুসলিম মানস এতটাই ক্ষিপ্ত ছিল এ ঘটনার কারণে যে, মসুলের

www.pathagar.com

জনপদে এমন কোনো দিন যায়নি, যে দিন তারা খ্রিষ্টানদের হাত থেকে জেরুজালেম তথা বায়তুল মুকাদ্দাস মুক্ত করার সংকল্প পুনঃব্যক্ত না করেছে!

এরকম এক পরিবেশেই বেড়ে উঠতে লাগলো ইউসুফ। দেখতে দেখতে সে কুরআনের হাফেজ হয়ে গেলো। একই সাথে সে হাদিসশাস্ত্রও অধ্যয়ন শুরু করেছিল। এ শাস্ত্রেও সে যোগ্য উস্তাদের হাত ধরে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে আর এর পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়া, তীর ছোঁড়া থেকে শুরু করে তলোয়ার চালানোও শিখে ফেলল খেলার ছলে।

তবে ইউসুফের চরিত্রে লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ দেখা দিল প্রকটভাবে। তার শখ, সে একজন আলেম হবে, ঠিক তার প্রিয় ওস্তাদ নুরুদ্দিনের মত! নুরুদ্দিন তার প্রিয় এই ছাত্রের মধ্যে সুকৌশলে যে কেবল জ্ঞান বিতরণ করলেন, তাই নয়, ইউসুফের কচি মনে তিনি নিজের বুকের গভীরে দীর্ঘদিন ধরে ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকা আগুনটাও জ্বালিয়ে দিলেন!

অবোধ শিশু ইউসুফ ওস্তাদের বুকে জ্বলা আগুন নিজের অজান্তেই বুকের মধ্যে ধারণ করে চলেছে। অচিরেই সেই আগুনের উত্তাপে সে নিজেই জ্বলে উঠবে দশ দিক আলোকিত করে। ধিকি ধিকি জ্বলা এ আগুনেই একদিন পুড়ে ছার খার হবে হাজার মাইল দূর হতে ধর্মীয় উন্মাদনায় ছুটে আসা ক্রুসেডারদের কপাল!

সেদিনের সেই শিশু ইউসুফই পরবর্তীকালে বিশ্ব ইতিহাসের কিংবদন্তি বীর, সুলতান গাজী সালাহউদ্দীন হিসেবে পরিচিত হবেন বিশ্বজুড়ে। অমর হয়ে রইবেন ইতিহাসের পাতায়!

www.pathagar.com

রাজনীতি বিমুখতাই মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা!

ঘটনাটি হলো, একটি সওদাগরি কোম্পানির সামান্য বেতন ভুক্ত কর্মচারী, কেরানি, রবার্ট ক্লাইভ (১৭২৫-১৭৭৪) ইতিহাসে আমরা, এই গোলামরা, যাকে 'লর্ড ক্লাইভ বলে জানি, তিনি যে রাতে মীরনকে দিয়ে নবাব সিরাজকে হত্যা করিয়েছিলেন, সে রাতে নাকি ঘুমুতে পারেন নি।

না, নবাব সিরাজের শোকে মুহ্যমান হয়ে নয়, বরং তিনি ঘুমুতে পারেননি ভয়ে, আতংকে; না জানি সকাল হলে যখন মুর্শিদাবাদের জনগণ জানবে তাদের নবাবকে হত্যা করা হয়েছে, যখন তারা জানবে, সেই সাত সাগর তেরো নদী পাড়ি দিয়ে আসা এক বেনিয়া ইংরেজ কেরানি তাদের দেশের নবাবকেই হত্যা করেছে, তারা কিভাবে নেবে এই সংবাদটিকে!

তারা বোধ হয় লাখে লাখে, দল বেঁধে ছুটে আসবে ইংরেজ কুঠির পানে, সবাই যদি মাত্র একটা করে ঢিলও ছোঁড়ে, তার পরেও তাদের আক্রোশ থেকে কোনমতেই জীবন বাঁচিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়া যাবে না! এই আতঙ্কেই তিনি সারা রাত ঘুমুতে পারেননি।

সারারাত তিনি ঘুমুতে না পারলেও লর্ড ক্লাইভ নাকি সকাল হতেই নিশ্চিন্তায়, নিরুপদ্রবে ঘুমিয়েছিলেন, সারাদিন তিনি ঘুমিয়েছিলেন।

ঘুমিয়েছিলেন কারণ, সারা রাত জেগেছেন, ভয়ে, আতঙ্কে। কিন্তু সকাল হতেই তিনি দেখলেন, মুর্শিদাবাদের জনগণ তাদের নবাবের মৃত্যু সংবাদ শুনল বটে কিন্তু সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল যার যার মত নিজের ধান্দায়।

রাখাল বালক প্রতিদিনের মতই গানের সুর তুলে গরুর পাল নিয়ে হাঁটা দিল মাঠ পানে। চাষি তার লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে ছুটল জমি চাষে। ব্যবসায়ী, বণিক ছুটল তার সওদা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করতে। গৃহবধূরা ছুটলেন ঘাটে জল নিতে। রাস্তা রাস্তায় শিশুরা মেতে উঠল খেলায়।

মুর্শিদাবাদের দৈনন্দিন জীবন চিত্রের কোন ব্যত্যয় নেই। কোন উত্তাপ ও নেই। সবই যেন স্বাভাবিক! রাজনীতি নিয়ে মাথা না ঘামানো বাংলা, বিহার আর মুর্শিদাবাদের জনগণ রাজনীতি থেকে সেদিনও মুখ ফিরিয়েই থাকল! লর্ড ক্লাইভ অবাক হয়ে এসব দেখলেন। তাঁর নিজের জবানীতেই তিনি বলেছেন;

'এসব দেখে আমার মনে এই আশ্বাস জন্মাল যে, যে দেশের জনগণ তাদের স্বাধীনতা নিয়ে এতটা উদাসীন, সে দেশে আমার মত ক্লাইভের কোন ভয় নেই। আমি নিরাপদ!'

আসলেই, তিনি নিরাপদই ছিলেন। সেদিন মুর্শিদাবাদের লোকজন প্রত্যেকে

www.pathagar.com

যদি মাত্র একটি করে ইটের টুকরা হাতে নিয়ে ছুটে আসত ইংরেজ কুঠির পানে, তা হলে সেদিনই উদ্ধার হতো ভারতীয় মুসলমানদের স্বাধীনতা।
কিন্তু না, সেদিন তা হয়নি। জনগণ বুঝে উঠতেই পারেনি নবাব সিরাজের হত্যাকান্ড নিছক একটা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ছিল না বরং এটা ছিল বাংলার স্বাধীনতাকে হত্যা করা। এটা ছিল বাংলার স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে নেয়া!!
এটা নিছক একটা রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ছিল না বরং ছিল দেশটার ভাগ্য বিপর্যয়। জনগণের এই অসচেতনতা আর রাজনীতি বিমুখতাই সেদিনকার বিপর্যয়ের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। জাতীয় ব্যর্থতা। আর এই ব্যর্থতাই ঘটিয়েছে ভারতীয় মুসলমানদের জীবনে এযাবৎ কালের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।
এরপরের ইতিহাস আর শ্রদ্ধেয় পাঠককে মনে করিয়ে দিতে হবে না। দীর্ঘ দুইটি শতাব্দীর গোলামির জিঞ্জির আমাদের কাঁধে। আর মুসলমানদের হাত থেকে শাসনক্ষমতা সেই যে গেছে, আজ পর্যন্ত তা আর ফিরে আসেনি। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের ভাগ্য আজও ফেরেনি সেই ঘটনার পর থেকে! এ উপমহাদেশের মুসলমানরা এখনও স্বাধীন হয়নি। তারা এখনও পরাধীনই বটে! পরাধীনতার রূপ বদলেছে মাত্র।

www.pathagar.com

লর্ড ক্লাইভ ও ইতিহাসের কান্না

ক'দিন আগে এক কাজে গিয়েছিলাম বার্মিংহামে এবং সেখানে হোটেলে একটা বিকেল ও একটা রাত অলস বসে থাকতে হয়েছিল। হঠাৎ মনে হলো, শুধু শুধু বসে থেকে সময় নষ্ট না করে কাছেই মাত্র পঞ্চাশ মাইলের দূরত্বে Shropshire শহরটা ঘুরে আসি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর এক ইংলিশ রাজাকে নিয়ে আমার চলমান একটা লেখা দীর্ঘদিন আটকে আছে, তার বাড়ি ছিল এই শহরে, এখনও সে বাড়ি ও কিছু নিদর্শন রয়েছে, লেখাটা শেষ করার জন্যই সে জায়গাটা সরেজমিনে ঘুরে দেখা দরকার, অতএব, যাই একটু ঘুরে আসি। আবহাওয়া ভালো ছিল, শনিবার ছুটির দিন হবার কারণে রাস্তায় ট্রাফিকও কম, তাই মাত্র ঘণ্টা খানেক ড্রাইভ করেই পৌঁছে গেলাম। সবুজ বন আর পাহাড়ে ঘেরা ছোট্ট Shropshire শহরটিতে হেঁটে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেল, এই শহরটাই ছিল লর্ড ক্লাইভের শৈশব আর তারুণ্যের আবাসস্থল।

আজ আমি যে পথে হেঁটে চলেছি হয়তো এরই কোথাও সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর ত্রিশ বা চল্লিশের দশকে কিশোর ক্লাইভ ন্যাংটা পায়ে খেলে বেড়িয়েছেন। এখান থেকেই কেবলমাত্র পেটের একমুঠো খাবারের জন্য বাৎসরিক মাত্র পাঁচ পাউন্ড বেতনের চুক্তিতে উনিশ বৎসর বয়সে ভারতে পাড়ি জমিয়েছিলেন, সেটা সেই ১৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনা। বেতন যাই হোক না কেন, ক্লাইভের বাবা মা'র বড় পাওয়া ছিল, একটা ছেলের ভরণ-পোষণের হাত থেকে তো বাঁচা গেল!

ক্লাইভ মাদ্রাজে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে কর্মরত থাকাবস্থায় দক্ষিণ ভারত, কর্নাটক ও আশপাশে বাণিজ্যের নামে যে শঠতা, চতুরতা আর প্রতারণার সাথে শোষণ চালিয়েছেন তার কোনো নজির ইতিহাসে নেই। এর ফলে মাত্র একটি দশক পরে ১৭৫৩ সালে তিনি যখন ইংল্যান্ডে ফেরত যান, সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন চল্লিশ হাজার পাউন্ড! কাল বিবেচনায় তা ছিল আজকের কয়েক মিলিয়ন পাউন্ডের সমপরিমাণ অর্থ।

একদিন যে বাবা-মা ঠিকমত দু'বেলা খেতে পেতেন না, সেই বাবা মাকে তিনি লন্ডনের অরমন্ড স্ট্রিটে ছয় হাজার পাউন্ড দিয়ে বাড়ি কিনে দিলেন, নিজের জন্য পাঁচ হাজার পাউন্ড দিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটা সিট কিনে নিয়ে হয়ে উঠলেন 'এলিট শ্রেণি'র একজন! (Raj-The making and Unmaking of British India. Lawrence James, পৃ: ২৯)

এর পরে তিনি ১৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরে আবারও এসে নামলেন

www.pathagar.com

মাদ্রাজের বন্দরে, সেখান থেকে শিগগিরই তার ডাক পড়লো বাংলায়। ভারতের, এমনকি, বিশ্বের সবচেয়ে সুখী ও ধনাঢ্য রাজ্য বাংলাকে তিনি যেভাবে লুট করেছেন, যে শঠতার সাথে তার কার্যসিদ্ধী করেছেন, যে নৃশংসতার সাথে বিরোধী মতকে দমন করেছেন, তার নজির বিশ্ব ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি নেই!

কোম্পানির শাসন ও শোষণকে নিরুপদ্রব করতে এই ক্লাইভ ও তার সহচররা বাংলার উপরে এক পরিকল্পিত দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দেন (১৭৬৯-১৭৭০)। ফলে মাত্র বছর দেড়েকের মধ্যে তৎকালীন বাংলার চার কোটি জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় এক কোটিই সে দুর্ভিক্ষে মৃত্যুবরণ করে! তদুপরি যে চতুরতা ও নৃশংসতার সাথে নবাব সিরাজকে হত্যা করানো হয়, যে নৃশংসতার সাথে তার মা আমেনা বেগমকে নদীতে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়, তার কোনো উপমা সভ্যসমাজে মেলা ভার!

অথচ কি অবাক বিস্ময়ের ব্যাপার, এই ক্লাইভ-ই কিনা হাউজ অব কমন্সে দাঁড়িয়ে, যখনও বাংলার আনাচে কানাচে তারই চাপিয়ে দেয়া দুর্ভিক্ষে মৃত্যুবরণ করা মানুষের লাশ পড়ে আছে, সেই তখন ১৭৭২ সালে পুরো ভারতবাসী, বিশেষ করে, বাংলার জনগণের চরিত্রকে মূল্যায়িত করেছেন অতি জঘন্যভাবে। শঠতা, নিষ্ঠুরতা, প্রতারণা আর প্রবঞ্চনার ষোলকলা দেখিয়েছেন ভারতবাসীকে যে ক্লাইভ, সেই ক্লাইভই মাথা উঁচু করে, ভারত বিজয়ী বীর হিসেবে বরিত হয়ে হাউজ অব কমন্সের ভরা মজলিসে দাঁড়িয়ে বললেন;

Hindostan was always an absolute despotic government. The inhabitants, especially in Bengal, in inferior stations are servile, mean, submissive and humble. In superior stations they are luxurious, effeminate, tyrannical, treacherous, venal, cruel. (সূত্রঃ Raj-The making and Unmaking of British India. Lawrence James, পৃঃ ৪৯)

'হিন্দুস্তানের প্রশাসন সব সময়ই নৈরাজ্যে ভরা। এখানকার অধিবাসীরা, বিশেষ করে, বাংলার অধিবাসীগণ প্রভাবহীন অবস্থায় তোষামুদে, নীচ প্রকৃতির, বিনয়ী ও নম্র এবং ক্ষমতাবান অবস্থায় তারা বিলাসী, পৌরুষহীন, উৎপীড়ক, প্রতারক, কপট ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির।'

হাসবো না কাঁদবো? ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। ইতিহাসের এক নিকৃষ্ট উৎপীড়ক, রক্তলোলুপ ঘাতক, ঘৃণ্য তস্কর কিনা বাঙ্গালির চারিত্রিক সনদ দিচ্ছে!

www.pathagar.com

ইতিহাস কোন লুটেরা নৃশংস খুনিকেই ক্ষমা করেনি, করে না। ভারতের কোন আদালতে এই তস্করের বিচার করা যায়নি, আর নিজ দেশ ইংল্যান্ডে তো তিনি বরিত হয়েছেন জাতীয় বীর হিসেবে। তবে বিবেকের আদালতে তিনি নিরন্তর দংশিত হতে থেকেছেন। আর সেই দংশন থেকে মুক্তি পেতেই কিনা জানি না, ইতিহাসের এই খলনায়ক নিজ গলায় ছুরি চালিয়ে আত্মহত্যা করেন ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ২২ শে নভেম্বর, শীতের এক বিকেলে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শিনী, চাক্ষুষ সাক্ষী, তার শ্যালিকা ও আত্মীয়া Ladz Strachey-এর বর্ণনায় সে বীভৎস দৃশ্য আমরা জানতে পাই।

উত্তর পশ্চিম লন্ডনের অভিজাত এলাকা Berkeley Square ধরে কখনও যদি হেঁটে যাই, তখনও যেন আমার কানে ক্লাইভের সেই গোঙ্গানির স্বর ভেসে আসে! ভাবি, হতভাগা নবাব সিরাজের অতৃপ্ত আত্মা কি সেই গোঙ্গানি শুনতে পেয়েছিল? ইতিহাসের এই কান্না কি আজকের জালিমরা শুনতে পান? পেলে বোধ হয় মজলুম মানবতার একটু উপকারই হতো!

www.pathagar.com

হায় ইতিহাস! তুমি কি মুখ খুলবে না?

কোহিনূর-এর নাম শোনেননি, এমন ক'জন আছেন? হ্যাঁ আমি বিশ্ববিখ্যাত হীরা কোহিনুর-এর কথা বলছি। ব্রিটিশ রানীর মাথার মুকুটে এখন তা শোভা পাচ্ছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের Crown Jewels! তবে তা এক সময় ছিল মোগল সম্রাটের মাথার মুকুট। ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এটা পাওয়া যায় বলে মনে করা হয়।

এর পর থেকে একের পর এক এর হাত বদল হতে থাকে। আলাউদ্দিন খিলজীর হাতে পড়ে, এর পরে তা এক পর্যায়ে মোগল সম্রাট বাবর, হুমায়ুন এবং তারও পরে সম্রাট শাহজাহানের হাতে পড়লে তিনি এটাকে ময়ূর সিংহাসনে বসান, এর পরে তা আওরঙ্গজেবের হস্তগত হয় আর সবশেষে ১৭৩৯ সালে নাদির শাহ যখন দিল্লি লুট করেন, তখন তিনি এটাকে নিয়ে যান পারস্যে, আর ১৭৪৭ সালে তিনি খুন হলে এই কোহিনুর আহমদের শাহ দুররানীর হাতে পড়ে, এক বৎসর না যেতেই আফগানিস্তানে রাশিয়ান আগ্রাসন ঘটলে তারই উত্তরসূরি মাসুদ শাহ কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসেন লাহোরে, আশ্রয় নেন শিখ রাজা; মহারাজা রঞ্জিত সিং এর কাছে।

অবশ্য তিনি এই কোহিনুরটাও সাথে করে আনতে পেরেছিলেন, রাজা রঞ্জিত সিং পলাতক মাসুদ শাহকে নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের শর্ত হিসেবে ঐ কোহিনূরের মালিকানা দাবি করেন। নিজের প্রাণ বাঁচাতে ওরকম শত কোহিনুর হাতছাড়া করতে প্রস্তুত ছিলেন মাসুদ শাহ। আর এভাবেই মহামূল্যবান কোহিনুর এসে পড়ে মহারাজা রঞ্জিত সিং এর হাতে ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের (১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে) পরে লাহোর চুক্তির মাধ্যমে পাঞ্জাবকে ব্রিটিশের হাতে তুলে দিতে হয়। কারণ এই চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল, কোহিনুর হীরক খণ্ডকে রানী ভিক্টোরিয়ার জন্য তুলে দিতে হবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে। অবশেষে লর্ড ডালহৌসী বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় তা ইংল্যান্ডে পাঠাবার ব্যবস্থা করলে ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা জুলাই বাকিংহাম প্যালেসে রানী ভিক্টোরিয়ার হাতে তুলে দেয়া হয়।

কোহিনুরের মূল্য কত? আধুনিক সময়কালের (২০১৫) মূল্য বিচারে এটার মূল্য ধরা হয়েছে ১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই বিশাল অংকের মূল্যবান পাথরটি আজ শোভা পাচ্ছে ব্রিটেনের রানীর মাথায়, যদিও একসময় বসানো হয়েছিল ময়ূর সিংহাসনে।

এসে গেল ময়ূর সিংহাসনের কথা। ইতিহাসখ্যাত এই সিংহাসন সম্রাট

www.pathagar.com

শাহজাহান বানিয়েছিলেন ১৬২৯ সাল থেকে ১৬৩৫ সালের দীর্ঘ সাত বৎসর সময়কাল ধরে। হযরত সুলাইমান (আ)-এর সিংহাসনের কথা শুনছিলেন তিনি, তাই তার ও তার চাটুকারদের শখ জেগেছিল সম্রাটের জন্য ওরকম একটা সিংহাসন বানানোর।

যেহেতু নবাবের দরবারে অভাব কিছুই নেই, তাই ১১৫০ কেজি (এক লক্ষ ভরি) সোনা, ২৫০ কেজি ওজনের বিভিন্ন হীরা, মণি, মুক্তা, রুবি পাথর দিয়ে তিন গজ লম্বা, আড়াই গজ চওড়া ও পাঁচ গজ উচ্চতার এ সিংহাসনটা বানানো হয়। নবাব শাহজাহান যেখানে তার পশ্চাৎদেশ স্থাপন করবেন, সেই স্থানে একটা বিশেষ গদি বা কুশন বসানো হয়েছিল, যার বর্তমান মূল্যই প্রায় দশ লক্ষ রুপি!

প্রখ্যাত ফরাসি পর্যটক ও রত্নব্যবসায়ী Jean-Baptiste Tavernier স্বচক্ষে দেখে এসে তার লেখায় বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, এরকম সাতটি সিংহাসন ছিল মোগল রাজদরবারে। তার মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও দামিটাই হলো ময়ূর সিংহাসন। তিনি নিজ চোখে দেখে গুনেছেন বড় বড় ২২৪টি হীরার টুকরো বসানো রয়েছে! তিনি সেকালের বাজারমূল্যে একটা হিসাবও দিয়েছেন; এক লক্ষ ছয় হাজার রুপি (সেই নভেম্বর; ১৬৬৫ সালের হিসাব)! আজকের বাজারমূল্যে অন্তত দশ বিলিয়ন রুপি!

এবারে আসুন তাজমহলের কথায়। এর কথা কি নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন রয়েছে? ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬৫৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এক নাগাড়ে বাইশ বৎসর ধরে বাইশ হাজার শ্রমিকের ঘাম আর রক্তে তৎকালীন মূল্যের তিন কোটি কুড়ি লক্ষ রুপি (বর্তমান সময়ের হিসেবে প্রায় ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) খরচ করে নিজ স্ত্রীর কবরের উপরে সৌধ বানিয়েছিলেন শাহজাহান, সেটাই তাজমহল।

জিনিসপত্রের দাম ছিল অতি সস্তা ও সহজলভ্য। ঐতিহাসিক গ্রন্থ তারিখে দাউদি'র বরাত দিয়ে জানা যায় সিকান্দার লোদীর আমলে একজন বিদেশি পর্যটক ভারতে খাওয়া দাওয়াসহ যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করেছেন, পুরো এক মাসে তার খরচ হয়েছে, এক রুপি বারো আনা মাত্র। (সূত্রঃ The Gazetteer of India দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য)

আগ্রার বাজার পর্যবেক্ষণ শেষে উক্ত পর্যটকের দেয়া তথ্য থেকে আরও জানা যায়, সে সময় উন্মুক্ত বাজারে গমের মিহি আটার মূল্য ছিল ১৫ দাম (Dam) বা সাড়ে সাঁইত্রিশ পয়সা প্রতি মন (এক দাম ছিল আড়াই পয়সা সমমানের একটি একক মুদ্রা, এই 'দাম' শব্দটিই কালক্রমে আমাদের বাংলা ভাষায় অঙ্গীভূত হয়েছে, আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এ শব্দটা

www.pathagar.com

হরহামেশাই ব্যবহার করে চলি; 'দাম' চুকিয়ে চলি!)। চাল ছিল কুঁড়ি দাম বা পঞ্চাশ পয়সা প্রতি মণ, গুড় ৫৬ দাম (Dam) বা এক রুপি চল্লিশ পয়সা, ঘি ১০৫ দাম (Dam) বা দুই রুপি বাষট্টি পয়সা প্রতি মণ। (সূত্রঃ ঐ)

আবুল ফজল কর্তৃক ১৫৯০ সালে রচিত বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ আইন-ই-আকবরিতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, সম্রাট আকবর শ্রমিক ও সরকারি কর্মচারীদের জন্য যে বেতন হার নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন তা অত্যন্ত কঠোরতার সাথে মেনে চলা হতো। সেখানে দেখা যায়, একজন কাঠমিস্ত্রির দৈনিক মজুরি ছিল দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা ভেদে ২ থেকে ৭ দাম (Dam) বা ৫ থেকে ১৫ পয়সা। একজন রাজমিস্ত্রির মজুরি ছিল দৈনিক ৩ থেকে ৩.৫ দাম (Dam) তথা সাড়ে সাত থেকে পৌনে নয় পয়সা। একজন সাধারণ সৈনিকের মাসিক বেতন নির্ধারিত ছিল আড়াই রুপি। সে সময়ে অতি সাধারণ মানের কুড়ি মণ চালের একটি চালানের মূল্য ছিল মাত্র ৪ রুপি! (সূত্রঃ ঐ) অর্থাৎ এক রুপিতে পাঁচ মণ সাধারণ মানের চাল পাওয়া যেত!

শুধু মোগলদের দোষ দিয়েই বা লাভ কী? ভারতে মুসলিম শাসনের একেবারে শুরুর দিকে সেই দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১১৯২) কুতুবউদ্দীন আইবেক থেকে শুরু করে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৩৬৯ খ্রিঃ) ফিরোজশাহ তুঘলক পর্যন্ত সকল শাসকের দৃষ্টিতে যেন ছিল উঁচু উঁচু চোখ ধাঁধানো ইমারত/ মিনার তৈরিই তাদের দায়িত্ব!

অথচ ইচ্ছা করলেই এই সব সুলতান, বাদশাহ, শাহানশাহগণ পুরো ভারতের প্রতিটি খাল-বিল, প্রতিটি নদ-নদীর উপরে বানাতে পারতেন ব্রিজ-কালভার্ট, প্রতিটি মহল্লায় বানাতে পারতেন স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি। পুরো ভারতে অন্তত একশত ক্যামব্রিজ, অক্সফোর্ড বা হার্ভার্ড বানানো যেত, প্রতিটি ইউনিয়নে, পঞ্চায়েতে বানানো যেত হাসপাতাল। প্রতিটি নাগরিকের জন্য আজীবন বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা যেতো। এসব কিছুই করা হয়নি।

এসব যখন ভাবি, তখন বড় আক্ষেপে নিজেকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে, মুসলিম নামধারী এই সব শাসকদের চিন্তা ও চেতনার চিত্রটা কেমন ছিল? তারা কোথা হতে, কোন ইসলাম শিখেছিলেন যে, সোনা-দানা-হীরা-জহরতের কদর বুঝেছেন কিন্তু এসবের চেয়ে লক্ষ-কোটি গুণ বেশি মূল্যবান মানুষের কদর বোঝেননি! তারা বোঝেননি যে, জনগণের আত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিক উন্নয়ন না হলে না দেশের নিরাপত্তা বজায় থাকে, আর না বজায় থাকে সমাজ, সভ্যতা ও সরকারের নিরাপত্তাটুকু!

বোঝেন নি বলেই কোহিনুর লুট হয়ে আজ অপরের শিরে শোভা পাচ্ছে!

www.pathagar.com

তখত-এ-তাউস বা ময়ূর সিংহাসনও হাতছাড়া! সেই কুতুব মিনার আজও দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে আছে তাজমহলও ঠিক, কিন্তু ধুলোয় লুটেছে কেবল মুসলমানের শিরটাই! ভারতের আনাচে কানাচে মুসলমানরা আজ কেবল নিজের প্রাণটুকু বাঁচানোর জন্য একটুখানি নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে ফিরছে!

হায় ইতিহাস, তুমি কি একটিবার মুখ খুলবে না? একটিবার কি বলে যাবে না এইসব জানবাজ (!) মুসলমানদের যে, এ পরিণতির জন্য তারা আর তাদের হঠকারিতাই দায়ী! বলে যাবে না? সময়ের সদ্ব্যবহার যে মুসলমান করে না, সময় তার বা তাদের উপরে প্রতিশোধ নেয়! একটাবার কি তাদের ডেকে বলবে না যে, সময় কাউকেই ক্ষমা করে না, সময়ের প্রতিশোধ বড়ই নির্মম হয়!

www.pathagar.com

হায়দ্রাবাদের কান্না ও আমাদের শিক্ষা–

হায়দ্রাবাদ, দক্ষিণ ভারতের এক অন্যতম নগরী, কসমোপলিটন নগরী। প্রায় দুই শত বৎসর শাসন করে ইংরেজরা যখন উপমহাদেশ থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যায় এ ভূখন্ডকে পাকিস্তান, ভারত, বার্মা, শ্রীলংকা এরকম এক একটা দেশে বিভক্ত করে রেখে, তখনও এই হায়দ্রাবাদ তার স্বাধীনতা রক্ষা করে রেখেছিলো কোনো মতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ ইংরেজদের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উসকানিতে, উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদী হিংস্রতায় ভারত একতরফা ভাবে আগ্রাসন চালিয়ে এ জনপদকে নিজের পেটে গিলে ফেলে ১৯৪৮ সালে। হায়দ্রাবাদ তার স্বাধীনতা হারায়।

যে রাজ্যটিকে মারাঠারা বার বার আক্রমণ করেও বশ্যতা স্বীকার করাতে পারেনি, যে রাজ্যটিকে মোগল সম্রাট শাহজাহান থেকে শুরু করে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত গিলতে পারেনি, সেই সুদূর পর্তুগাল ও স্পেন থেকে পর্তুগিজ ও ফরাসি সৈন্যরা বছরের পর বছর চেষ্টা করেও অধীনতা স্বীকার করাতে পারে নি, এমনকি, যে জনপদকে পদানত করতে স্বয়ং নেপোলিয়ান বোনাপার্টও স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন, মহিশুরের টিপু সুলতানকে মিশরে বসেই চিঠি লিখে আশ্বস্তও করেছিলেন এই বলে যে, তিনি মিশরের ঝামেলা শেষ করেই ভারতের দিকে মনোযোগ দেবেন, টিপু যেন তার কথায় আস্থা রাখেন। (সূত্রঃ White Mughals William Dalrymple, পৃ: ১১১)

সেই জনপদকেই ভারত পদানত করে সহজেই! কিন্তু কিভাবে? এ প্রশ্নের উত্তরটার মধ্যেই রয়েছে আরও অনেক প্রশ্নের উত্তর। একটা সময় পর্যন্ত শত শত লোভাতুর দৃষ্টির পরেও হায়দ্রাবাদ নিজের স্বাধীন সত্তা টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল। মোগল সাম্রাজ্যের বাইরে ভারতের সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী রাজ্য, সবচেয়ে ধর্নাঢ্য, পাহাড় নদী আর সবুজ বনের সমারোহে অপরূপ এ জনপদ যে কোনো আগন্তুকের দৃষ্টি কেড়ে নেবে প্রথম দর্শনেই।

মোসি নদীর তীর ঘেঁষে সেই ১৫৯১ সালে সুলতান কুলি কুতুব শাহ এ নগরীর ভিত্তি গাড়েন। গোলকুন্ডার বিখ্যাত হীরার খনি থেকে হীরা আহরণ ও আর তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা হীরা ব্যবসার উপরে নিজের বা নিজেদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখাটাই বোধ করি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

এর কারণও ছিল অবশ্য। আধুনিক বিশ্বে দক্ষিণ ও পশ্চিম আফ্রিকার কয়েকটি দেশে হীরার খনি আবিষ্কারের পূর্বে এই হায়দ্রাবাদেই ছিল বিশ্বের একমাত্র হীরা খনি! সারা বিশ্ব থেকে হীরা, রত্ন ব্যবসায়ীরা সারা বৎসর হায়দ্রাবাদের অলি গলিতে ঘুর ঘুর করতো।

www.pathagar.com

বাড়ির পাশে মোগল সম্রাট, পর্বতমালার ওপারের চীন থেকে শুরু করে সেই ইউরোপের রোম কিংবা প্যারিস অথবা প্রাক ভিক্টোরিয়া যুগের ইংল্যান্ড, হল্যান্ড সবারই নজর ছিল গোলকুন্ডার উপরে। এ সব স্থানের বড় বড় ব্যবসায়ী বা রাজা-রাজড়ার এজেন্টরা সারা বৎসর চষে বেড়াতো এ জনপদ কেবলমাত্র মহামূল্যবান এ পাথরের একটি মাত্র টুকরো হস্তগত করার জন্য! (সূত্র : ঐ)

মোগল সম্রাটের কোহিনুর মুকুটের কথা আমরা জানি, এ মুকুটটি আজ ইংল্যান্ডের রানীর মাথায় শোভা পাচ্ছে। এই মুকুটটিতে প্রায় দুই শত মহামূল্যবান হীরা-চুন্নি-মুক্তাসহ বিভিন্ন নামীদামি পাথর থাকলেও তার নাম কোহিনুর হয়েছে একটিমাত্র কারণে, তা হলো, এসব মহামূল্যবান রত্নের মধ্যে সবচেয়ে দামি ও দুষ্প্রাপ্য যে হীরকখন্ডটি রয়েছে, তার নামও কোহিনুর। বিশ্বের সবচেয়ে নামী, সবচেয়ে দামি হীরক খণ্ডের নামেই নামকরণ করা হয়েছে মুকুটটির। বলাই বাহুল্য, এই কোহিনুরটিও পাওয়া গেছে এই গোলকুন্ডাতেই।

এ বাস্তবতা সুলতান কুলি কুতুব শাহ খুব ভালো করেই জানতেন। ভারতের দক্ষিণ উপকূল জুড়ে হাজার হাজার পর্তুগিজদের নজর রয়েছে এর উপর, নজর রয়েছে মারাঠা, এমনকি, মহিশুরের টিপুরও। এ ছাড়াও দক্ষিণের উপকূলীয় অঞ্চলের সাথে মোগলদের সংযোগ পথেই গোলকুন্ডার অবস্থান। অর্থনৈতিক গুরুত্ব ছাড়াও সামরিক এবং বাণিজ্যিক, উভয় বিচারেই এ অঞ্চলের গুরুত্ব সীমাহীন!

কাজেই সুলতান এ অঞ্চলে নিজের নিয়ন্ত্রণকে স্থায়ী করতেই গোলকুন্ডার পাশে মুসী নদীর তীর ঘেঁষে একটি নগর স্থাপনের পরিকল্পনা করলেন। ভাবনার সাথে সাথে দেরি না করে কাজও শুরু করলেন। সেটা সেই ১৫৯১ সালের ঘটনা।

সুলতান কুলি কুতুব শাহ ছিলেন শিয়া ধর্মাবলম্বী। তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল ইস্পাহানে 'সাফাউই' ('সাফাবি' বা 'সাফাভি' হিসেবেও পরিচিত) সম্রাটের সঙ্গে। কট্টর সাফাভি শিয়াজিমের অনেক শিক্ষা, অনেক দর্শনই ইসলামের মৌলিক শিক্ষা তাওহিদের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। তা ছাড়া, প্রিয় রাসূল (সা:)-এর সম্মানিত সাহাবীদের কারো কারো প্রতি এদের বৈরিতা সকল ভব্যতা ও সাধারণ ভদ্রতারও সীমালংঘন করে। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের দৃষ্টিতে সংগত কারণেই তারা ইসলামের গন্ডিতে পড়ে না।

তা ছাড়া ভারতীয় সাম্রাজ্যের হয়েও, মোগল সীমান্তে বসবাস করেও

www.pathagar.com

সাগরপাড়ের ইস্পাহানের সাথে রাজনৈতিক, আদর্শিক, মনস্তাত্ত্বিক ও বাণিজ্যিক ঘনিষ্ঠতা সঙ্গত কারণেই কেবল আওরঙ্গজেব নয়, কোনো মোগল সম্রাটেরই সহ্য হওয়ার কথা নয়। তা ছাড়াও সুলতান পারস্যের ইস্পাহানসহ অন্যান্য বিভিন্ন শহর থেকে ভাগ্যের সন্ধানে আসা ইরানি সাফাভি শিয়া মতাদর্শী অনেক কবি-সাহিত্যিক, সৈনিক, শিল্পী, লেখক, বুদ্ধিজীবী, পণ্ডিত এবং আলেম-ওলামাকে পুরো শহরজুড়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পৃষ্ঠপোষকতা দেন। এভাবে অনেকটা অলিখিতভাবেই ইরানের বাইরে পুরো হায়দ্রাবাদ জুড়ে শিয়া মতাদর্শ এ রাজ্যের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ে। এ বাস্তবতাও আশপাশের রাজ্যের শাসক ও অধিবাসীদের নজর এড়ায়নি, তারা বিষয়টাকে খুব একাট ভালো চোখে দেখেনি। কাজেই মোগল সাম্রাজ্যের সাথে গোলকুন্ডার নিয়ন্ত্রণের অধিকারী কূলী কুতুব শাহের বিরোধে অবাক হবার কোনো কারণ নেই।

এতসব বাস্তবতাকে মাথায় রেখে সুলতান তার পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে মাঠে নামলেন। গড়ে তুলতে লাগলেন একটি নতুন নগরী। শিয়া দর্শনের মূল কেন্দ্রে রয়েছে ইসলামের চতুর্থ খলিফা, প্রিয় রাসুল (সা:)-এর জামাতা, হযরত আলী (রা:)-এর অস্তিত্ব। এ মহামানবকে ঘিরেই তাঁর শাহাদাতের পরে মুসলমানদের একটা বিভ্রান্ত গোষ্ঠী শিয়া মতবাদের উদ্ভব ও বিস্তার ঘটায়। হযরত আলী (রা:) সাধারণত আলী ইবনে আবি তালেব নামেই পরিচিত। কিন্তু এর বাইরে তাঁর আরও একটি নাম প্রচলিত আছে জানি, অনেকেই তাকে 'হায়দার' বলে ডাকেন।

অত্যন্ত নিষ্ঠাবান শিয়া মুসলমান সুলতান কুলি কুতুব শাহ নতুন যে নগরীর গোড়াপত্তন করলেন, সেই শহরের নামও রাখলেন এই আলী হায়দার, নামের শেষাংশ; 'হায়দার' শব্দটির সাথে মিলিয়ে 'হায়দ্রাবাদ'। যেখানে 'হায়দার' আবাদ হবে, যে সমাজ, যে নগর হযরত আলীর মত শত শত 'আলী হায়দার' জন্ম দেবে!

জনবল, শ্রম ও লোকবল আর সম্পদের যখন কোনো অভাব নেই, তখন তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। তিনি তার নতুন শহর হায়দ্রাবাদকে সাজালেন মনের মত করে, নয়নাভিরাম সৌন্দর্যে!

এর মাত্র ষাটটি বৎসর পরে ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি পর্যটক M de. Thevenot যখন নতুন এ নগরী পরিভ্রমণ করেন, তিনি তার জবানীতে একে 'Country of Diamond' 'হীরার দেশ' বা 'হীরানগর' বলে অভিহিত করেছেন।

উপকূলীয় বন্দর মুসালিপট্টম-এ নিয়োজিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির

www.pathagar.com

অফিসার, জেনারেল William Methwold' ও এর কিছুকাল পরে গোলকুন্ডা তথা নতুন এ নগর; হায়দ্রাবাদ সফর করেন। নগরীর প্রাচুর্য, ঐশ্বর্য আর সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হয়ে এক চিঠিতে কোম্পানির হেড অফিস মাদ্রাজে তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে যা লেখেন, তার সরল বাংলা দাঁড়ায়;

এই শহরের নির্মল বাতাস, সুমিষ্ট পানি, উর্বর মাটির কথা না হয় বাদই দিলাম, সুলতানের প্রাসাদের কথা বলি, মর্মর পাথরে গড়া, সোনায় মোড়ানো এ প্রাসাদের উপমা পুরো মোগল সাম্রাজ্যে আর দ্বিতীয়টি নেই! এর প্রতিটি খুঁটি নাটি, এমনকি, দরজা-জানালার চৌকাঠ পর্যন্ত সোনা দিয়ে মোড়ানো! এদের কোষাগারে পৃথিবীর সবচেয়ে দামি রত্নগুলো মওজুদ রয়েছে। ভারতবর্ষের সবচেয়ে ধনী এ রাজ্যের সুলতান বিজাপুরের রাজকন্যাকে বিয়ে করেছেন, এ ছাড়াও সুলতানের আরও তিনজন স্ত্রী ও এক হাজার রক্ষিতা রয়েছে! (সূত্র : ঐ)

অন্য এক সূত্র থেকে জানা যায়, সুলতানের মনোরঞ্জনের জন্য সদাসর্বদা প্রস্তুত রাখা হতো প্রায় কুড়ি হাজারের মত নর্তকী! এদের মধ্যে থেকেই পছন্দনীয়দের ডেকে নিয়ে সুলতান প্রতি শুক্রবার নাচের বিশেষ আয়োজন করতেন। নারিঙ্গীর সাথে সারিঙ্গি, আর সুরের সাথে সুরারও ব্যবস্থা থাকতো।

শহরটি আয়তন, এর গুরুত্ব ও ঐশ্বর্য ক্রমেই বিস্তৃত হয়েছে যেমনি, তেমনি তা বার বার বহিঃশত্রুর আক্রমণের শিকারও হয়েছে। সম্রাট আওরঙ্গজেব তো ১৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দে শহরটিকে ধ্বংস করে ছাড়েন।

কিন্তু তারপরেও মাত্র কয়েকটি দশকের মধ্যে হায়দ্রাবাদ আবার নিজের পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ফিরে পেয়েছে এর ঐশ্বর্য আর সুনাম। হয়ে উঠেছে আরবি, ফার্সি ও উর্দু ভাষার এক লীলাভূমি! শত শত কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী, পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীরা চারিদিক থেকে এসে ভিড় করেছেন, বসতি গেড়েছেন এ শহরে। দেখতে দেখতে রাজ্যের জনসংখ্যা আড়াই লক্ষে পৌঁছে যায়। এদের মধ্যে পারসিক, আরব, চীনা, ফরাসি, ইংরেজ, পর্তুগিজসহ নানা দেশের লোকজন স্থানীয় নারীদের বিয়ে করে বসতি গেড়েছেন।

বাইরে থেকে ব্যবসা, ভ্রমণ বা অন্য কোনো কাজে এসে বসবাসকারীদের মধ্যে একজন সুদর্শন স্কটিশ ইংরেজ জেনারেলও ছিলেন। এই জেনারেলও চৌদ্দ বসর বয়সী এক রাজকুমারীর মধ্যে গড়ে উঠা অসম প্রেম, সন্তান ধারণ এবং এ ঘটনার পরবর্তী পরিস্থিতি হায়দ্রাবাদের রাজনীতিতে এক

www.pathagar.com

সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখে যায়! এ রাজ্যের রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থাকে চিরদিনের জন্য পরিবর্তিত করে দিয়ে যায় এই একটিমাত্র অসম ও করুণ প্রেমের ঘটনা; কিন্তু এ প্রেমের ঘটনা ঘটতে পেরেছিল যে সাংস্কৃতিক ও নৈতিক আবহে, তার দিকে নজর না দেয়াটা হবে আত্মপ্রবঞ্চণা মাত্র!

সে ঘটনার প্রায় দেড় শত বৎসর পরে এসে ভারত কর্তৃক ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদকে সফলভাবে হজম করতে পারার পেছনে সেই পরিবর্তন একটা অন্যতম মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

আমরা আজ যারা হায়দ্রাবাদ হজমের পেছনে ভারতের ভূমিকার সমালোচনা করি, তাদের উচিত, সমালোচনার আগে ইতিহাসের প্রতিটি পরতে পরতে নিজেদের ব্যর্থতা, অমার্জনীয় গাফিলতি আর ত্রুটিগুলোকে চিহ্নিত করা, সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের আদর্শ আর জীবন-যাপন প্রণালী তথা সংস্কৃতিকে শুধরে নেয়া, তা না হলে হায়দ্রাবাদ হজম করার মত ঘটনা বার বার ঘটতেই থাকবে।

www.pathagar.com

প্রশ্নটা কি একটু কঠিন হয়ে গেল?

দিনটা ছিল ২ নভেম্বর, শনিবার। আগের দিন ১ নভেম্বর শুক্রবার ভোরে মসজিদে নববিতে ফজরের নামাজে ইমামতির জন্য দাঁড়ানো মাত্রই বসরার গভর্নর হযরত মুগীরা বিন শুরাহ (রা:)-এর মদিনাস্থ পারসিক দাস ফিরোজ আবু লুলু বিষাক্ত ছুরি দিয়ে এক এক করে পর পর ছয়টি আঘাত হানে হযরত ওমর (রা:)-এর পেটে ও তলপেটে। তাঁর নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে যায় সেই আঘাতে। সেদিনই দুপুরের পরে হযরত ওমর (রা:)-কে একটু দুধ পান করতে দেয়া হলে সেই দুধও হজম ছাড়াই বের হয়ে আসে। তা দেখে সকলেই বুঝে নেন, এ যাত্রা আর খলিফাকে বাঁচানো সম্ভবপর নয়।

খলিফা নিজেও সেটা বুঝে গেছেন। এখন অপেক্ষা কেবল মালাকুল মওতের জন্য। পরদিন শনিবার হযরত ওমর (রা:) পুত্র প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরকে কাছে ডেকে নিলেন। আব্দুল্লাহ পিতার মুখের কাছে মাথাটা একটু এগিয়ে নিলে হযরত ওমর (রা:) অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুললেন। কি বলেছেন তিনি? সেটা বলার আগে আরও একটা ঘটনা বলে নেই।

ঘটনাস্থল মদিনা শহর থেকে শ' দুয়েক মাইল দূরে সিরিয়ামুখী যাওয়া ৬৫৬ মাইল লম্বা প্রাচীন রাস্তার পাশে এক বেদুঈন পল্লীতে। সময়কালটা সম্ভবত ৬৩৬-৩৭ খ্রিষ্টাব্দের দিকে হবে। খলিফা ওমর প্রায়ই মদিনা ছেড়ে রাজ্যের আনাচে কানাচে চলে যেতেন সাধারণ মানুষের খোঁজ খবর নেয়া ও নিজ চোখে তাদের অবস্থা দেখার জন্য। এরকমই একটা সফরে তিনি এসেছেন এই এলাকায়, সফরসঙ্গী হযরত আলী (রা:) একটু দূরে কিছু লোকের সাথে কথা বলছিলেন।

এমন সময় তিনি দেখলেন সিরিয়া অভিমুখে চলে যাওয়া পথের পাশে খাটানো একটি তাঁবুর পাশে রাস্তার উপরে এক বৃদ্ধা মহিলা বসে আছেন। কৌতূহলী হয়ে ওমর (রা:) বুড়ির পাশে থামলেন। তার কাছে জানতে চাইলেন তিনি কেন রাস্তার পাশে একাকী বসে আছেন?

বুড়ি জীবনেও ওমর (রা:)-কে দেখেননি, তাঁর নামটাই শুনেছেন কেবল। এক আগন্তুকের অযাচিত প্রশ্নে বড় নির্লিপ্ততা ও বিরক্তির সাথে বুড়ি বলে উঠলেন;

– শুনেছি আমিরুল মুমিনীন ওমর আজ এ পথে যাবেন, তার সাথে আমার দেখা করার খুবই দরকার, তাই রাস্তার পাশে তাঁবু খাটিয়ে বসে আছি।

হযরত ওমর (রা:) হাঁটু গেড়ে বৃদ্ধার পাশে বসলেন। খুব আগ্রহ নিয়ে

www.pathagar.com

জানতে চাইলেন;
– আচ্ছা বুড়ি মা, আমিরুল মু'মিনীন ওমর কেমন লোক?
– ঐ বদ লোকটার কথা আর জানতে চেয়ো না বাপু, ওর কথা শুনে তোমার কি কাজ? তুমি বরং তোমার কাজে যাও।
– ওমা, সে কি কথা! তুমি খলিফাকে বদলোক বলছো?
– বদলোক বলবো না? তুমিই বলো বাছা, কত কষ্টে দিন পার করছি অথচ আজ পর্যন্ত খলিফার নিকট থেকে একটা কানাকড়িও সাহায্য পেলাম না!
বুড়ির কথা শুনে হযরত ওমর ভেতরে ভেতরে আঁতকে উঠলেন। কোমল কণ্ঠে, যেন অনেকটা খলিফাকে এই বুড়ির অভিযোগ থেকে ডিফেন্ড করতে বা বাঁচাতেই বলে উঠলেন;
– মা, তুমি তো খলিফা থেকে অনেক দূরে থাকো, তিনি হয়তো তোমার এই কষ্টের খবরই পাননি।
– দূরে থাকার কারণে তিনি যদি আমার খবরই না নিতে পারেন, তা হলে তাকে খলিফা হতে বলেছে কে?
ক্ষোভ আর অনুযোগ মেশানো কণ্ঠে বুড়ি এক ঝটকায় বলে গেলেন কথাগুলো। হজরত ওমর (রা:) এর কপালে এবারে চিন্তার ভাঁজ পড়লো। নীরব, বাকহীন হয়ে তিনি ভাবনার গভীরে ডুবে গেলেন।
তাই তো, ইসলামি রাজ্যের আনাচে কানাচে এরকম কত অসহায়, দুস্থ ও অভাবগ্রস্ত মানুষ না জানি পড়ে রয়েছেন, যাদের খবর তিনি নিতে পারেননি! এদের খবরই যদি তিনি নিতে না পারেন তা হলে তাদের খলিফা হতে গেলেন কেন?
হযরত ওমরের মনোজগতে তখন নীরবে নিভৃতে বয়ে চলেছে এক ঝড়। পাশে বসা বুড়ির সেদিকে কোন খেয়ালই নেই! তিনি বসে আছেন কখন আমিরুল মু'মিনীন ওমর (রা:) এই পথে আসেন, তাকে আজ ধরতেই হবে, সে অপেক্ষায়।
ওদিকে হযরত আলী (রা:) অনতিদূরে লোকজনের সাথে কথা শেষ করে এগিয়ে এলেন ওমর (রা:) এর খোঁজে। রাস্তার পাশে এক বুড়ির পাশে আমিরুল মু'মিনীনকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলেন। হযরত ওমর (রা:) এর সেদিকে খেয়ালই নেই। তিনি ডুবে আছেন গভীর এক ভাবনার জগতে! হযরত আলী (রা:) কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং আনমনা হয়ে বসে থাকা হযরত ওমর (রা:) এর মনোযোগ আকর্ষণে সালাম দিলেন;
– আসসালামু আলাইকুম ইয়া আমিরুল মুমিনীন।
হঠাৎ করেই হযরত ওমর (রা:) এর সম্বিত ফিরে এলো যেন। তিনি

www.pathagar.com

সালামের জবাব দিলেন। কিন্তু তাঁর পাশে বসে থাকা সেই বুড়ি তা শুনে ফেলেছেন। বুড়ি মহিলা বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলেন;

– আমিরুল মুমিনীন? আ আনতা আমিরুল মুমিনীন ওমার? (তুমিই কি খলিফা ওমর?)

– হ্যাঁ মা, আমিই তোমাদের হতভাগা খলিফা ওমর। হযরত ওমর (রা:) এর সকুণ্ঠ জবাব।

এবারে বুড়ি লজ্জিত হলেন, ভয়ও পেলেন। আলী (রা:) আগা মাথা না বুঝলেও কিছু একটা আঁচ করতে পেরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা শুনতে লাগলেন। বুড়ি মহিলা হযরত ওমর (রা:) এর দিকে বিব্রত ও ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকালেন যা হযরত ওমর (রা:) এর নজর এড়ালো না।

এর পরে হযরত ওমর (রা:) অনেকক্ষণ সময় কাটালেন সেই বৃদ্ধার সাথে, তাকে আশ্বস্ত করলেন। তার অনুযোগ, অভাব অভিযোগের কথা শুনলেন। তাকে রাষ্ট্র থেকে পেনশনের ব্যবস্থা করে দিলেন।

কিন্তু তার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে এ পর্যন্ত অতিবাহিত হওয়া বিগত দিনে রাষ্ট্র থেকে এই বুড়ির পাওনাগুলোর কি হবে? তিনি বসে বসে একটা হিসেব করলেন সেখানে বসেই। বুড়ি মহিলাকেও সেই হিসেবে শামিল করলেন, অংশ নিলেন হযরত আলীও।

হিসাব-নিকাশ করে দেখা গেল মোটামুটি ২৫টি স্বর্ণমুদ্রা হলে বুড়ির পাওনা পরিশোধ হয়। তিনি তার হাতে পঁচিশটি স্বর্ণমুদ্রা ধরিয়ে দিলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে আশাতিরিক্ত পেয়ে বুড়িও যারপরনাই খুশি। কিন্তু হযরত ওমর (রা:) এতটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। তিনি বুড়িকে অনুরোধ করলেন, তার ওপর অর্থাৎ আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা:) এর উপরে বুড়ির যে আর কোনো দাবি নেই, সে কথাটা আলী (রা:) এর সামনে ঘোষণা দিতে, চাইলে তিনি লিখেও দিতে পারেন।।

বুড়ি সানন্দচিত্তে একটা চামড়ার উপরে এরকম না দাবি নামা লেখায় টিপ মারলেন। হযরত ওমর (রা:)কে আশ্বস্ত করলেন যে, তিনি কাল কেয়মাতের মাঠে খলিফার বিরুদ্ধে কোনো দাবি তুলবেন না।

এক অখ্যাত বৃদ্ধার কাছ থেকে পাওয়া এই শিক্ষা খলিফা ওমরকে এতটাই প্রভাবিত করেছিল যে, এর পরে তিনি প্রায়ই বলতেন, আল্লাহর কসম, ফোরাতের তীরে একটা কুকুরও যদি না খেয়ে মারা যায়, আমার ভয় হয়, কাল কেয়ামতের মাঠে আমাকে তার জন্যও জবাবদিহি করতে হবে! এ কথা বলে তিনি কাঁদতেন!

সেই ভয় তাঁর কাটেনি আজও, এই মৃত্যুশয্যাতেও। তিনি পুত্র আব্দুল্লাহ

www.pathagar.com

(রা:) কে বললেন, দ্রুত হিসেব করে দেখতে, ক্ষমতারোহণের দিন থেকে একজন খলিফা হিসেবে তিনি কি পরিমাণ অর্থ ভাতা হিসেবে গ্রহণ করেছেন? পরিমাণ যাই হোক না কেন, মৃত্যুর পর যত দ্রুত সম্ভব ওমর (রা:) এর সম্পত্তি বিক্রি করে যেন সেই অর্থ পুরোটাই বায়তুল মালে জমা দিয়ে দেয়া হয়।

তিনি জানেন না, খলিফা হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে পেরেছেন কি না। অতএব তিনি তার প্রাপ্য ভাতাও নেবেন না এই ভয়ে যে, যদি তার দ্বারা দায়িত্ব পালনে গাফিলতি হয়ে থাকে, তা হলে এই ভাতা তার জন্য বৈধ বিবেচিত হবে না।

পরদিন ৩রা নভেম্বর, রবিবার খলিফা ইন্তেকাল করলেন। তাঁর সেই অসিয়ত সহসাই পালন করা হয়েছিল। দীর্ঘ একটি দশক সময়কালে খলিফা হিসেবে নেয়া ভাতা আটষট্টি হাজার দিরহাম রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফেরত দেয়া হয়েছিল।

ঘটনাটা জানার পর থেকে ভেবে হয়রান হচ্ছি, আমাদের সাড়ে সাত কোটি কিংবা বারো কোটি বা ষোলো কোটি জনতার কাছে কার যে কতটা দায় রয়ে গেছে, তার হিসাব কে রাখে?

রাঘব বোয়ালদের কথা না হয় বাদই দিলাম। আমরা নিজেদের কথাই বলি। সংসারে কতভাবে জেনে বা না জেনে কতজনের কত হক নষ্ট করেছি, বুঝে বা না বুঝে কতজনের উপরে কত জুলুম করেছি, জুলুমের উপলক্ষ হয়েছি বা হতে দিয়েছি! আজ এই বয়সে এসে তাদের হাতে সেই বুড়ির মত করে ক'টা স্বর্ণমুদ্রা ধরিয়ে দেবো, সে সামর্থ্য যেসব বুড়োদের নেই, তাদের কী হবে? প্রশ্নটা কি একটু কঠিন হয়ে গেল?

www.pathagar.com

এই একটা ক্ষেত্রেই আমাদের অনীহা বটে!

সম্রাট জাহাঙ্গীর, চতুর্থ মোগল সম্রাট। ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দের চব্বিশে অক্টোবর দিল্লির মসনদে বসেন। অনেক সাধের মসনদ তার। এই মসনদের জন্য তাকে নিজ পিতা আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হয়েছে। যুদ্ধেও জড়াতে হয়েছে নিজ পিতার বিরুদ্ধে। আর তা তিনি করবেনই না বা কেন? পিতা আকবর ১৫৫৬ সালে সেই যে মসনদে বসলেন, এক নাগাড়ে দীর্ঘ পঞ্চাশটি বৎসর আর সেই মসনদ ছাড়ার নামটি পর্যন্ত নিলেন না। কতদিন আর ধৈর্য ধরে রাখা যায়? একটা মানুষের আয়ুই বা আর কতদিন হয়? শেষ পর্যন্ত কি ক্ষমতার স্বাদ না নিয়েই মরতে হবে? অতএব পিতার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করলেন তিনি। ক্ষমতা পেতেই হবে!

অশিক্ষিত আকবরের কপাল ভালো ছিল যে, বাবা হুমায়ুন তার মৃত্যুর দুই মাস পূর্বেই পুত্র আকবরের জন্য একজন দক্ষ ও বিশ্বস্ত অভিভাবক হিসেবে বৈরাম খানকে নিয়োগ করে গিয়েছিলেন, তা না হলে, এক এক করে নয় নয় জন হিন্দু, রাজপুত ও মারাঠা ধাত্রীর (দুধ মা) দুধ পান করা আকবরের কয়েক ডজন দুধ ভাই এবং সে সূত্রে অন্যান্য আত্মীয়রা তাকে কতল করে দিল্লির মসনদ দখল করে নিতো। কুশলী বৈরাম খাঁ সকল প্রাসাদ ষড়যন্ত্রকে কঠোর হাতে ও অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সামাল দিয়ে আকবরের শাসনক্ষমতাকে সংহত করেছেন।

আকবর কিছুদিন না যেতেই সেই বৈরাম খাঁকেই পদচ্যুত করে মক্কায় হজ্জ করতে পাঠালেন। অবশ্য লোকে বলে তার পিছু পিছু তিনি একজন ঘাতকও পাঠিয়েছিলেন। ঘাতক ঠিকই পথিমধ্যে বৈরাম খাঁকে পরপারে পাঠানোর ব্যবস্থা করে সুচারুরূপেই। ঘাতককে যেই পাঠাক না কেন, বৈরাম খাঁর মক্কা পর্যন্ত যাওয়া তো দূরের কথা, ভারতের সীমানাও পেরুতে পারেননি তিনি!

বৈরামের পর আকবরের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন যিনি; তিনি হলেন, আবুল ফজল। ভারতের প্রথম মুক্তমনা আঁতেল শেখ মুবারকের পুত্র, ফৈজির ছোট ভাই আবুল ফজল নিজেও ছিলেন একজন মুক্তমনা। হিন্দু, মারাঠা, রাজপুতসহ বিভিন্ন রাজার সুন্দরী কন্যাদের আকবরের হেরেমে সরবরাহ নিশ্চিত করতেন এই আবুল ফজল, অশিক্ষিত আকবরকে ঘৃণিত মুতা বিয়ের ফতোয়াও জুগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ফলে আকবরের হেরেম তিনশত বিবাহিতা স্ত্রী আর পাঁচ হাজার ক্ষণস্থায়ী স্ত্রী নিয়ে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল সহসাই।

আকবরের মধ্যে ঈশ্বরের গুণাবলীও আবিষ্কার করেছিল এই আবুল ফজল

www.pathagar.com

আর তার বাবা শেখ মুবারক! হিন্দু, রাজপুত, মারাঠা, প্রায় সকল গোষ্ঠীই আকবরের উপরে তাদের সন্তুষ্টি বজায় রেখেছে, সেটা এই আবুল ফজলেরই কূটনৈতিক সাফল্য।

জাহাঙ্গীরের ক্ষমতাপ্রাপ্তির পথে তার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছোট ভাই মুরাদ ১২ মে ১৫৯৯ বুধবার সন্ধ্যায় অতিরিক্ত মদপান করে ওভারডোজে মারা যায়। কিন্তু এর মধ্যে জাহাঙ্গীর এক ভুল করে বসেন। মদ্যপ অবস্থায় তিনি বাবা আকবর ও তার প্রধান পরামর্শদাতা আবুল ফজলের অতি কাছের তিন কর্মচারীকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করেন। বিষয়টা শুনে আকবর রাগে ফেটে পড়েন। আবুল ফজল তো হিতাহিত জ্ঞান হারাবার মতো হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু জাহাঙ্গীর হাজার হলেও আকবরের পুত্র, তাই সে খুব সাবধানে এগুতে থাকে।

এ ঘটনার পর থেকে আকবর তার কনিষ্ঠ পুত্র দানিয়েলের দিকে ঝুঁকে পড়েন। দানিয়েলকে তিনি সকল কাজে গুরুত্ব দিতে থাকেন। আবুল ফজলও দানিয়েলের সাথে যোগাযোগ বাড়িয়ে দেন। আবার একই সময় আবুল ফজল তো বটেই, এমনকি, পিতা আকবরও বেশ কয়েক মাস জাহাঙ্গীরকে তার সাথে দেখা করা বা দরবারে আসার অনুমতিও দেননি।

জাহাঙ্গীরের বুঝতে বাকি রইলো না, সিংহাসন তার হাতছাড়া হতে চলেছে। বাবা আকবর তার উপরে ক্ষেপেছেন এবং নিশ্চিতভাবেই ছোটভাই দানিয়েলই তার উত্তরসূরি হিসেবে মনোনীত হবে। এ সময় একটা আজব কান্ড ঘটতে থাকলো। বড় দুই ভাই জাহাঙ্গীর আর মুরাদের মত দানিয়েলও ছিল মদ্যপ। নিয়মিত মদপান করতো। তার শরীরের অবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে চলে যাওয়াতে চিকিৎসক তাকে মদ পান করা থেকে বিরত থাকতে কড়া নির্দেশ দিয়েছিল। বাবা আকবরও কড়া নির্দেশ জারি করেছিলেন দানিয়েলের কাছে যেন কোনো মদ সরবরাহ করা না হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আকবরের অগোচরেই দানিয়েলের দেহরক্ষীরা তাকে মদ সরবরাহ শুরু করলো। ফলে মাত্র বৎসর দেড়েকের মধ্যেই দানিয়েলের স্বাস্থ্যের মারাত্মক অবনতি হলো। তার দিন ঘনিয়ে আসছে সেটা প্রায় সকলেই বুঝতে পারছে তত দিনে।

জাহাঙ্গীর এবারে নজর দিলেন আবুল ফজলের দিকে। এই ব্যাটাকে শায়েস্তা করতে না পারলে তার শান্তি হচ্ছে না। আবুল ফজল এক কাজে কিছু সৈন্য নিয়ে দিল্লি থেকে আগ্রা যাচ্ছিল। এ খবরটা জাহাঙ্গীর রাজা বীর সিংহকে জানিয়ে দেন, আর বলে দেন যে, এই লোকটার ব্যবস্থা করতে পারলে ভবিষ্যতে জাহাঙ্গীর তার এ বদান্যতাকে মনে রাখবেন।

www.pathagar.com

রাজা বীর সিংহ ওঁত পেতেই ছিলেন, আগ্রার পথে আবুল ফজলকে হত্যার জন্য সে প্রায় পাঁচশত সৈন্যের এক বাহিনী পাঠালে তারা ১৬০২ খ্রিষ্টাব্দের ১২ আগস্ট সোমবার আবুল ফজলকে হত্যা করে। বীর সিংহ আবুল ফজলের কাটা মাথা জাহাঙ্গীরের কাছে পাঠালে জাহাঙ্গরি সেই মাথাটা নিজ হাতে নিয়ে গিয়ে তার টয়লেটে মলমূত্রের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। আর এভাবেই তিনি সিংহাসন প্রাপ্তির পথে তার সবচেয়ে বড় বাধা ভেবে আবুল ফজলকে সরিয়ে দেন।

অতি বিশ্বস্ত আবুল ফজলকে হারিয়ে আকবর দিশেহারা হয়ে পড়েন। তিনি তার গোয়েন্দা মারফত জানতে পারেন যে, জাহাঙ্গীর রাজা বীর সিংহকে দিয়ে এ কাজটা করিয়েছেন। বেচারা আবুল ফজল! অযথাই সন্দেহের বশে তাকে জীবন দিতে হলো। কেননা, এর মাত্র কিছুদিন পরেই ১৬০৩ সালে সবার ছোট ভাইটা, দানিয়েলও অতিরিক্ত মদ্যপানজনিত কারণে (ওভারডোজে) মৃত্যুবরণ করে।

এর পরেও জাহাঙ্গীরের ভয় ছিল মনে। পাঁচ সহস্রাধিক স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নেয়া কোন সন্তান আকবরকে পিতা হিসেবে ঘোষণা দিয়ে যদি খোদ মসনদের দিকেই নজর দিয়ে বসে, তা হলে জাহাঙ্গীরের বিপদ বাড়বে। কাজেই জাহাঙ্গীর সে বিষয়ে খুবই সচেতন ছিলেন। চূড়ান্ত কিছু একটা করার দরকার, এমন চিন্তা-ভাবনা তার মন-মগজে আসন গেড়ে থাকলো কিছু দিন।

ওদিকে মদ্যপ দুই দুইটি সন্তান হারানোর পরে আকবরের মাথায় পরবর্তী উত্তরাধিকার নিয়ে চিন্তা নতুন করে বাসা বেঁধেছে। ঠিক এ সময় আকবরের বৃদ্ধা মা হামিদা বানু এবং ফুফু গুলবদন এগিয়ে এলেন। মা হামিদা বানু এক সন্ধ্যায় তার সন্তান, মোগল সম্রাট আকবরকে ডেকে পাঠালেন রাতের খাবারের জন্য। আকবর মায়ের সামনে উপবিষ্ট, তার অপর স্ত্রী সালিমা বেগমও রয়েছেন, ঠিক এমন সময় ফুফু গুলবদন শাহজাদা সেলিম তথা জাহাঙ্গীরকে হাত ধরে এনে দাদী হামিদা বানু ও বাবা আকবরের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

দীর্ঘদিন পরে একমাত্র জীবিত সন্তানকে দেখে আকবর আবেগতাড়িত হয়ে পড়লেন আর চতুর জাহাঙ্গীর এই সুযোগে বাবার পায়ের উপরে মাথা রেখে বসে পড়লেন, ক্ষমা চাইলেন। অশ্রু মুছতে মুছতে আকবর সন্তান জাহাঙ্গীরকে তুলে বুকে টেনে নিলেন। সেটা ছিল ১৬০৩ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এক রাতের ঘটনা।

এর বছর দেড়েক পরে ১৬০৫ সালের ১৫ অক্টোবর এক শনিবারের বিকেলে

www.pathagar.com

আকবর মারা যান। আর তার ক'টা দিন পরে ২৪ অক্টোবর শনিবার শাহজাদা সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করে দিল্লির মসনদে বসেন।

জাহাঙ্গীরের পরবর্তী কাজ কর্মের ইতিহাস টেনে আর একদিন দেখানোর চেষ্টা করবো যে, এই জাহাঙ্গীরের মত এত বড় নৃশংস নরপতি ভারতের মসনদে আর বসেনি। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, মোগল সম্রাটদের মধ্যে তার মত এত বড় নবীবিদ্বেষী (মুহাম্মদ সা: বিদ্বেষী) আর কেউ ছিল না।

সুধী পাঠক এতক্ষণ এ নিবন্ধে যে সামান্য ইতিহাস বর্ণনা করলাম এর কোথাও কি ইসলামের ছিটেফোঁটার উপস্থিতি দেখেছেন? অথচ এই কর্মকাণ্ডগুলোকেই যখন ঐতিহাসিকরা ইসলামি বা মুসলমানদের শাসন বলে চালিয়ে দেন, তখন তারা ঘৃণ্য এক মিথ্যাচার করেন।

আর আমি, আপনি, আমরা যখন সেই মিথ্যাচারকে অবলীলায় মেনে নেই, তখন আমরা ইসলামের উপরে আরোপিত কালিমাকেই মেনে নেই। অথচ আমাদের উচিত ছিল প্রতিবাদী হওয়া। এক্ষেত্রে প্রতিবাদের সবচেয়ে কার্যকর পথ হলো, ইতিহাস চর্চা করা, তা প্রচার, প্রসারে অবদান রাখা। অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানচর্চায় রত থাকা। অবশ্য এই একটা ক্ষেত্রেই আমাদের দারুণ অনীহা বটে!

www.pathagar.com

কাদেসিয়ার প্রান্তরে গিয়ে হাজির হয়েছে মুসলিম বাহিনী। মরুচারী আরবদের পারসিকরা নিজেদের প্রতাপ প্রতিপত্তিতে উন্মত্ত হয়ে বড়ই হেয় চোখে দেখতো, তাদেরকে নিজেদের চেয়ে অনেক বেশি নীচু জাতি হিসেবে বিবেচনা করতো। হাজার হাজার বৎসরের ঐতিহ্য, উন্নত সভ্যতার ধারক হিসেবে তারা ছিল বড়ই উদ্ধত ও গর্বিত। সম্পদ আর ঐশ্বর্যের কোন কমতি ছিল না তাদের।

আর অপরদিকে আরবরা ছিল মরভূমির বেদুইন। তাদের কোনো স্থায়ী বসতি ছিল না, ছিল না নগর সভ্যতাভিত্তিক কোন সমাজব্যবস্থাও। একমাত্র উট বা মেষপালন ও ব্যবসার মাধ্যমেই তাদের জীবনধারণ চলতো। সেই তারাই প্রবল প্রতাপশালী পারস্য সাম্রাজ্যকে ভয় দেখাতে হাজার মাইল মরু পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে! বিষয়টা ভাবতে গেলেই পারস্য সম্রাট তৃতীয় ইয়াজদিগার্দ ও তার প্রধান সেনাপতি রুস্তমের সারা মুখমন্ডল রাগে লাল হয়ে যায় যেন। সম্রাট ইয়াজদিগার্দ সেনাপতি রুস্তমকে নির্দেশ দিলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই অশিক্ষিত, বর্বর আরবদের যেন শায়েস্তা করা হয়।

নির্দেশ পেয়ে রুস্তম বিশাল সেনাবাহিনী প্রস্তুত করলো। তবে চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরুর আগে সে ভাবলো, মক্কা থেকে আগত আরবদের একটু বুঝিয়ে বলা দরকার যে, তারা কত বড় দুঃসাহসী একটা কাজ করতে এসেছে, এটা তাদের জন্য কত বড় একটা বোকামি ও আত্মঘাতী কাজ, সেটা বুঝিয়ে বললে হয়তো তাদের সম্বিত ফিরে আসতেও পারে। যুদ্ধ ও প্রাণ এবং সম্পদের হানি এড়িয়ে আরবদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে যদি ফেরত পাঠানো যায়, তবে সেটাই ভালো। অযথা এই গরিব আরবদের মেরে লাভ কী? আর তা ছাড়া মরুভূমির এই বেদুইন আরবদের সাথে কি প্রবল প্রতাপশালী ও ক্ষমতাবান পারসিক বাহিনীর যুদ্ধ করা মানায়!

এমনটা ভেবে সে মুসলিম বাহিনীর সামনে এক ভাষণ দিলো। উক্ত ভাষণে সে তার স্বভাবসুলভ বাকপটুতায় বললো;

'এই বিশ্বের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী খোদা; যার হাতে আকাশ পাতাল সকল কিছুর নিয়ন্ত্রণ, যার নির্দেশেই সকল কার্য সম্পাদিত হয়, আমরা কেবল তাকেই ভয় পাই। সেই খোদার কৃপা বর্ষিত হোক আমাদের এই পারস্য সিংহাসনের একমাত্র যোগ্য অধিপতি, যার কুদরতি কারিশমায় তিনি অনিষ্টকর সকল শক্তিকে ঠেকিয়ে রাখেন, যিনি তার বীরত্ব, বিচক্ষণতা আর প্রতাপ দিয়ে আলোকিত করে রেখেছেন এই মহান সাম্রাজ্যকে, সেই

www.pathagar.com

মহামান্য নৃপতির উপর। দুঃখের বিষয় হলো সেই আমাদেরকেই তোমাদের মুখোমুখি হবার মত পরিস্থিতি দেখতে হলো!

আমাকে আগে এটা বলো, তোমরা কারা? তোমরা কোন ধরনের লোক? তোমাদের ধর্ম আর জীবনাচারই বা কী? ভিক্ষুকের দল! ভিক্ষুক বাহিনী নিয়ে কার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করতে এসেছো? এক টুকরো রুটি পেলেই তোমরা সন্তুষ্ট হয়ে যাও!

তোমাদের কি আছে? একটা হাতি পর্যন্ত নেই! রসদ নেই, যানবাহন নেই, নেই লাটবহর! কি নিয়ে যুদ্ধ করবে তোমরা? হাতি-ঘোড়া, সৈন্য-সামন্ত, খাদ্য-রসদ, শক্তি সামর্থ্য আর ক্ষমতা যা আছে তা আছে একমাত্র এই ইরানের। এখানে, এই মাটিতে যে তোমরা পা রাখতে পেরেছো, সেটাই তো তোমাদের মহাসৌভাগ্য!

এ রাজ্যের যিনি মহান অধিপতি, তার পূর্বপুরুষগণ সকলেই ছিলেন এক একজন মহান শাহানশাহ! তিনি যখন প্রকাশ্যে আসেন, তা উজ্জ্বলতায় চাঁদও নিস্প্রভ হয়ে যায়! তিনি যখন হাসেন, তার দাঁতগুলো রুপার উজ্জ্বলতায় চক চক করে! একজন আরব গোত্রপ্রধানের যে সম্পদটুকু আছে সেই পরিমাণ সম্পদ তিনি যখন তখন বিলিয়ে দেন অথচ, তার ভান্ডারের এতটুকুও কমতি হয় না তাতে!

তার রয়েছে বারো হাজার চিতা বাঘ, পোষা বাজপাখিসহ নানান পোষাপ্রাণী, এদের প্রতেক্যের গলাতেই শোভা পাচ্ছে সোনার হার! সামান্য উটের দুধ আর মরুভূমির পোকা মাকড় খেয়ে জীবন বাঁচায় যে আরবরা, সেই তোমরা এই সিংহাসনের লোভে এতদূর ছুটে এসেছো, তোমাদের কি চক্ষুলজ্জা বলতে কিছু নেই? হুঁশ জ্ঞান কি তোমাদের বিবেকবোধ জাগাতে পারেনি?

তোমাদের যে বংশ পরিচয়, তোমাদের যে সামাজিক অবস্থান তা দিয়ে কি সত্যি সত্যিই তোমরা এমন একটা মহিমান্বিত সিংহাসন, একটা সাম্রাজ্য আশা করো? তোমরা যদি তোমাদের যোগ্যতা বলে এই পৃথিবীর কোনো অংশ পেতে চাও, তা হলে তো তোমাদের ভাগ্যে কিছুই জুটবে না! (কারণ তোমাদের কোনো যোগ্যতাই নেই)।

তোমরা বরং আমার কাছে তোমাদের মধ্য হতে এমন একজন লোক পাঠাও যে অন্তত আমাকে একটুকু অন্তত বলতে পারে তোমরা কারা? কী তোমাদের দর্শন? কে তোমাদেরকে এই মহান সাম্রাজ্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে?

আমি মহামান্য শাহকে অনুরোধ করে পত্র লিখবো তিনি যেন দয়া করে তোমাদেরকে কিছু দান-দক্ষিণা দেন। ততক্ষণ আমার পরামর্শ হবে তোমরা

www.pathagar.com

অন্তত এই বিশাল প্রতাপশালী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়ো না, কারণ সে যুদ্ধের পরণিতি কী হবে, সেটা নির্ভর করবে এই সাম্রাজ্যের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরেই কেবল।

এই চিঠিতে যে পরামর্শ দেয়া হয়েছে, নিজেদের চোখ-কান আর বুদ্ধির উপরে অন্ধের মত পর্দা না টেনে সেসব পরামর্শগুলোকে একটু ভালো মত ভেবে দেখো।'

এ কথা বলে সে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা:) বরাবর একটা চিঠিও দিলো। চিঠি পেয়ে মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রথমে হযরত জুহরা (রা:) কে পাঠানো হলো, তাঁর সাথে আলাপে ইরানি বাহিনীর কোনো সুবিধা হলো না। তারা অন্য কাউকে পাঠাতে বললো। এবারে গেলেন সাহাবি হযরত মুগিরা (রা:)।

ইরানি জেনারেল রুস্তম তার স্বভাবসিদ্ধ বাকপটুতায় হযরত মুগিরা (রা:) কেও পারস্য সাম্রাজ্যের হাজার বৎসরের গৌরবগাথা শোনাতে লাগলো। পারসিকদের মোকাবেলায় আরবরা যে কতটা হীন, কতটা অপাঙক্তেয়, সে ফিরিস্তি দিতে থাকলে হযরত মুগিরা (রা:) তাকে থামিয়ে দিলেন কথার মাঝখানেই।

অত ফিরিস্তি শোনার মত সময় আর ধৈর্য তাঁর ছিল না। তিনি সোজা রুস্তমের চোখের দিকে তাকিয়ে তার চোখের উপরে চোখ রেখে বললেন; হয় তোমরা ইসলাম কবুল করো, আর না হয় আমাদের জিজিয়া প্রদান করো, আমি কথা দিচ্ছি, তোমাদের জানমালের নিরাপত্তা দেবো। আর তা না হলে যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও, এই তলোয়ারই তোমাদের আর আমাদের মধ্যে ফয়সালা করবে।' বলে তিনি নিজের কোমারে থাকা তলোয়ারটার ইঙ্গিত করলেন।

রুস্তম তার জীবনেও এরকম দুঃসাহস দেখেনি, বিশেষ করে, একজন আরব তার মুখের উপরে এত বড় কথা বলবে সেটা তার কল্পনাতেও আসেনি। সে রাগে ফেটে পড়তে চাইলো যেন, নিজ আসন ছেড়ে উঠে চিৎকার করে বলে উঠলো; খোদার কসম! আগামী কালের ভোর আর তোমরা দেখতে পাবে না, তার আগেই আমি তোমাদের হত্যা করবো।'

যুদ্ধ শুরু হলো। সেদিনটা ছিল বুধবার ১৬ নভেম্বর, ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার। আর মাত্র তিন দিনের মাথায় ১৯ নভেম্বর মঙ্গলবার সকালে রুস্তমের কাটা মাথাটা আর এক সাহাবি হযরত হেলাল (রা:)-এর তরবারির আগায় দুলছিল। হযরত মুগিরা (রা:) এর কথাই সত্য হয়েছিল তরবারির মাধ্যমেই যুদ্ধের ফয়সালা হয়েছিল।

www.pathagar.com

সারা পারস্যবাসী, সে সাথে সারা বিশ্ববাসী দেখেছে, ইরানিরা তাদের হাজার বৎসরের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ যে পারস্য সাম্রাজ্যকে নিয়ে গর্বে বুক চিতিয়ে চলতো, সেই সাম্রাজ্য কিভাবে লুটিয়ে পড়লো যে আরবদের কাছে তারা সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করতো, এমনকি, তাদের সাথে একত্রে বসা তো দূরের কথা, কথাটা পর্যন্ত বলতে অপমান বোধ করতো, সেই বেদুইন আরবদের পদতলেই! অকল্পনীয় বিত্ত-বৈভব, হাজার বৎসরের ঐতিহ্য, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, আত্মম্ভরিতা, দম্ভ, দর্প আর অহংকারে উদ্ধত সশস্ত্র বিশাল সৈন্যবাহিনীও তাদের সকল শক্তি নিয়ে হাতে গোনা অশিক্ষিত, অপ্রশিক্ষিত অপেশাদার আরব মুসলমানদের কাছে টিকতে পারেনি।

ইতিহাসের এ যুদ্ধ আমাদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, গর্ব আর অহংকার আপাতদৃষ্টিতে যতই শক্তিশালী বলে দৃশ্যমান হোক না কেন, তা আসলে বড়ই দুর্বল শাশ্বত সত্যের সম্মুখে। অহংকারীর পতন অনিবার্য, যদি তার সম্মুখে সত্য তার যথাযথ রূপ নিয়ে হাজির হতে বা দাঁড়াতে পারে। কাদেসিয়ার প্রান্তরে সেই সেদিন প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত এ ঐতিহাসিক শিক্ষাটা কেবল সে যুগের জন্যই নয়, বরং সকল যুগের বেলাতেই সত্য ও অকাট্য এক বাস্তবতা।

www.pathagar.com

গাজী সালাহউদ্দীন-মানুষ সালাহউদ্দীন

এক.

একবার সুলতান সালাহউদ্দীন আইউবী তার নিয়মিত কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে সৈন্যবাহিনী পরিদর্শনে বেরিয়েছেন। তাঁর সাথে সাথে অপর ঘোড়ায় ছিলেন তারই জীবনীকার বাহাউদ্দীন। বাহাউদ্দীন তার এক রচনায় লিখেছেন; সুলতানের পাশে চলতে চলতে এক সময় তিনি তার ঘোড়া নিয়ে তার সম্মুখে এগিয়ে যান, সামনে ছিল ছোট্ট একটা ডোবার মত, সেখানে বাহাউদ্দীনের ঘোড়া লাফিয়ে উঠলে কাদা পানি ছিটকে পেছনে পেছনে আসতে ব্যস্ত সুলতান সালাহউদ্দীনের গায়ে পড়ে। তাঁর সাদা ধবধবে কাপড় কর্দমাক্ত হয়ে যায়।

সুলতান সালাহউদ্দীন আইউবী ফেটে পড়েন, তবে রাগে নয়, অট্টহাসিতে! বাহাউদ্দীনসহ সুলতানের অপর খাদেম তার পরিধানের কাপড় পরিষ্কার করে দিতে চাইলে তিনি তা করতে দেননি, বরং নিজের হাতে তা ধুয়ে পরিষ্কার করে নেন। সালাহউদ্দীন আইউবী তখন সিরিয়া ও মিশরের সুলতান।

দুই.

সালাহউদ্দীন আইউবীর প্রতিপক্ষ ইউরোপীয় বাহিনীর সেনাপতি ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানি থেকে কয়েক লক্ষ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের জন্য জেরুজালেমে গিয়ে বসে আছেন। মাঝে মধ্যেই দুই পক্ষের মধ্যে ছোটখাটো যুদ্ধ সংঘর্ষ ঘটছেও।

তবে পুরোমাত্রায় যুদ্ধ তখনও শুরু হয়নি। ফিলিস্তিনের জাফা এলাকায় এক অভিযানে গিয়ে রাজা রিচার্ডের ঘোড়া যুদ্ধের ময়দানে আহত হয়ে পরে মারা যায়।

এ কথা শুনে সালাহউদ্দীন একটা তেজি আরবি ঘোড়া উপহার হিসেবে পাঠালেন রিচার্ডের কাছে। সাথে একটা পত্রও পাঠালেন, লিখলেন; সুদূর ইংল্যান্ড থেকে এসে ইংল্যান্ডের রাজা মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবেন, সেটা তার জন্য বড়ই বেমানান। আপনার জন্য আরবের এই তেজি ও শ্রেষ্ঠ ঘোড়াটা পাঠালাম। আশা করি এটা আপনার উপযুক্ত হবে।

তিন.

একবার কায়রোর এক ব্যবসায়ী স্থানীয় আদালতে কাজির কাছে সে দেশের সুলতান সালাহউদ্দীনের বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করলো। তার অভিযোগ, সুলতান সালাহউদ্দীন নিজের এক ক্রীতদাসের সম্পত্তি

www.pathagar.com

অন্যায়ভাবে দখল করে নিজের নামে নিয়েছেন। তার দাবির স্বপক্ষে মামলার বাদি উক্ত ব্যবসায়ী প্রয়োজনীয় দলিল-পত্রও দাখিল করলো।

মামলা পেয়ে কায়রোর কাজি সুলতান সালাহউদ্দীনকে সমন পাঠালেন আদালতে হাজির হবার ও আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য। নির্ধারিত দিনে সালাহউদ্দীন আদালতে হাজিরা দিতে এলেন এবং নিজের পক্ষে লড়ার জন্য একজন উকিলও নিয়োগ দিলেন।

আদালতে কাজির সামনে বিচারপ্রার্থী উক্ত ব্যবসায়ীর পাশেই বসলেন বিবাদি, মিশরের সুলতান গাজী সালাহউদ্দীন। মিশরের সুলতান হিসেবে কিংবা আদালতে বিচারকের আসনে আসীন কাজির নিয়োগদাতা হিসেবে তার জন্য আলাদা বিশেষ কোন আসন বা নিরাপত্তা বা সম্মানের ব্যবস্থা করা হলো না।

বিচার পরিচালনার সময় দায়েরকৃত অভিযোগ ও পুরো ঘটনাকে সাক্ষ্য প্রমাণ সাপেক্ষে পর্যালোচনা করে দেখা গেল, সুলতান সালাহউদ্দিনের একজন দাস ছিলেন, তার সম্পত্তিও ছিল। সুলতানের পক্ষের উকিল অত্যন্ত সফলভাবে প্রমাণ করলেন যে, বাস্তবিকই মহামান্য সুলতানের একজন দাস ছিলেন এবং তিনি তাকে অনেক আগেই মুক্ত করে দিয়েছেন। মুক্ত করে দেয়ার পরে সুলতান আলোচ্য সম্পত্তি উক্ত দাস ও তার উত্তরাধিকারদের হাতে ফেরত দিয়েছেন।

এ বক্তব্য প্রদানের পর উকিল তার বক্তব্যের সমর্থনে আজাদকৃত উক্ত দাসের জনৈক উত্তরাধিকারকে সাক্ষী হিসেবে আদালতে হাজিরও করলেন। পুরো ঘটনার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, সাক্ষ্য, প্রমাণ ও দলিল দস্তাবেজ বিচার করে দেখা গেল, বাদি যে দলিল আদালতে দাখিল করেছেন, তা জাল। কাজি মামলা খারিজ করে দিলেন, বাদি হেরে গেলো।

মামলায় জিতে সুলতান সালাহউদ্দীন বিবাদির দিকে চেয়ে দেখলেন এক মুহূর্ত। বিবাদি লজ্জায় কিংবা অনুতাপে মুখ নিচু করে বসে আছে। সুলতানের মনে দয়া হলো। তিনি তার সেক্রেটারিকে ডেকে নির্দেশ দিলেন, বাদিকে তার মামলা পরিচালনায় ব্যয়কৃত যাবতীয় অর্থ এবং নিজ বাড়ি ফিরে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তা খরচ পরিশোধ করার জন্য।

সালাহউদ্দীন এমনটা করলেন দয়া পরবশ হয়ে এবং সেই সাথে এটাও প্রমাণ করার জন্য যে, আদালতে তার বিরুদ্ধে মামলা করায় তিনি বাদির বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ নন এবং নিজ মনে কোনো ক্ষোভ বা আক্রোশও পোষণ করেন না।

www.pathagar.com

চার.

জেরুজালেমে ক্রুসেডারদের নেতা ও সেনাপতি রেজিন্যাল্ড ছিল অতি নীচ প্রকৃতির একজন। ব্যক্তিজীবনে সে ছিল উগ্র, মদ্যপ ও নিষ্ঠুর। এই নরাধম মুসলিম বিদ্বেষ ও পৈশাচিক বর্বরতার জন্য কুখ্যাত হয়ে আছে। অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় সে ধৃত মুসলিম নারী, শিশু ও বৃদ্ধদেরকে হত্যা করতো।

কোনো সবল মুসলিম পুরুষকে হাতে পেলে সে বর্বর পৈশাচিকতায় দীর্ঘ সময় নিয়ে তিলে তিলে হত্যা করতো আর হতভাগ্য মুসলিমকে বলতো; তুই তোর আল্লাহকে ডাক, তোর নবী মুহাম্মদকে ডাক, তারা এসে আমার হাত থেকে তোকে বাঁচাক! সে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে রেখেছিল; মদিনা দখল করে প্রিয় নবীজির লাশ তুলে সে নিজের হেফাজতে নেবে আর মুসলমানদেরকে সেই লাশ দেখার জন্য কর ধার্য করবে। ইতিহাসে তাকে Reginald of Chatillon হিসেবেও ডাকা হয়।

যা হোক, জেরুজালেম বিজয়ের পর সে ধৃত হয়, তাকে তওবার সুযোগ দেয়া হলেও সে নিজ অপরাধ স্বীকার করে অনুতপ্ত হতে অস্বীকার করে এবং বলে; যুদ্ধে এ ধরনের ঘটনা ঘটেই থাকে। তওবার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করার ফলে বহু প্রাণ হত্যার অপরাধে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

জেরুজালেম অধিকার করার পরে এই রেজিন্যাল্ড-এর বিধবা স্ত্রী এসেছে সুলতান সালাহউদ্দীনের কাছে আর্জি নিয়ে। স্বামী নিহত হওয়ার পরে তাকে দেখা শোনার জন্য একমাত্র অবলম্বন ছিল তার ছেলে, সেও আজ মুসলমানদের হাতে বন্দী, ফলে তিনি বড় অসুবিধার মধ্যে আছেন। ছেলেকে মুক্ত করানোর মত কোনো অর্থও তার হাতে নেই। অনেক বন্দীই সালাহউদ্দীনের কাছ থেকে মুক্ত হয়ে ইউরোপে চলে গেছে, অনেকে মুক্তিপণ দিয়ে নিজেদের মুক্তি নিশ্চিত করেছে।

বিধবা নারীর আকুতি শুনে অনেক চিন্তা করে তিনি তার ছেলেকে মুক্ত করে দিলেন, অথচ এই ছেলেটা ছিল পূর্ণযৌবনপ্রাপ্ত একজন খ্রিষ্টান যোদ্ধা, মুসলমানদের কট্টর দুশমন, কুখ্যাত খ্রিষ্টান জেনারেল রেজিল্যান্ড-এর ছেলে। যুদ্ধ করতে এসেই মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছে এবং ছেড়ে দিলে সে আবারও খ্রিষ্টান যোদ্ধাদের সংঘবদ্ধ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নামতে পারে। তারপরও কেবলমাত্র একজন দুঃখিনী মা'র মুখের দিকে চেয়ে তারই আবেদনের প্রেক্ষিতে সুলতান সালাহউদ্দীন তাকে মুক্ত করে দিলেন!

www.pathagar.com

পাঁচ.

বর্তমান জর্ডানের রাজধানী আম্মানের একশত চব্বিশ কিলোমিটার দক্ষিণে ক্রুসেডারদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্ভেদ্য একটা দুর্গ (Kerak- কেরাক) তখনও রসদ ও হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে।

সুলতান সালাহউদ্দীন জেরুজালেম দখল করলেও তার নজরে রয়েছে এই দুর্গসহ আশপাশে খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের আরও কয়েকটি দুর্গ দখল করে যুদ্ধের একটা স্থায়ী সমাপ্ত টানা, তা না হলে যে কোনো সময় এই সব দুর্গ হতে ইউরোপীয় খ্রিষ্টান ক্রুসেডাররা সমন্বিত যৌথ আক্রমণ পরিচালনা করে মুসলমানদের কষ্টার্জিত বিজয়কে ভন্ডুল করে দিতে পারে।

কয়েক মাস আগেও তিনি একবার এই দুর্গটা দখল করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, অবরোধ বসিয়েছিলেন, কিন্তু সফল হতে পারেননি। ইউরোপ থেকে আগত খ্রিষ্টান সৈন্যরা দুর্গটিকে দুর্ভেদ্য করেই কেবল গড়ে তোলেনি, তারা এর মধ্যে হাজার সৈন্য ও বহুদিন চলার মত রসদ জমা করে রেখেছিল।

এবারেও তিনি পুনরায় অবরোধ করেছেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তার গোয়েন্দাদের মাধ্যমে খবর পেলেন যে, দুর্গের মধ্যে বিয়ের একটা উৎসব চলছে। রাজা রেল্যান্ড-এর ছেলে হামফ্রে জেরুজালেমের খ্রিষ্টান রাজার বোন ইসাবেলার সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন, আর পুরো দুর্গজুড়ে অবস্থানরত হাজার হাজার খ্রিষ্টান সৈন্য সামন্ত ও তাদের পরিবার পরিজনদের মধ্যে তারই আনন্দ বয়ে যাচ্ছে।

সুলতান সালাহউদ্দীন ও তার সভাসদরা খবরটা শুনে একটু আশ্চর্যান্বিতই হলেন। বিষয়টা দুর্গের ভেতরে খ্রিষ্টান সৈন্যদের মনোবল ও মুসলমানগণ কর্তৃক আরোপিত অবরোধের ব্যাপারে তাদের নিস্পৃহতাকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়!

সুলতান সালাহউদ্দীনও ছাড়বার পাত্র নন। মুসলিম সৈন্যরা বেশ ক'মাস ধরে দুর্ভেদ্য এ দুর্গ অবরোধ করে রেখেছে। দুর্গটার সামরিক গুরুত্ব বিবেচনায় তা দখল করাটা তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এর কোনো বিকল্প নেই। এ জন্য তিনি মাঝে মধ্যেই দুর্গের বহির্দেশের পুরু দেয়াল ভেঙে ফেলার জন্য সেই দেয়াল লক্ষ্য করে কামানের গোলা নিক্ষেপ করতে বলেছিলেন সৈন্যদের।

সৈন্যরা সে নির্দেশ পালনও করে চলেছিল। কিন্তু আজ গুপ্তচরদের মাধ্যমে দুর্গের অভ্যন্তরে বিয়ে এবং তাকে ঘিরে আনন্দ উৎসবের এই খবর শোনার সাথে সাথে তিনি তার জেনারেলদের ডেকে দুর্গ লক্ষ্য করে গোলা নিক্ষেপ

www.pathagar.com

বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিলেন, বললেন; বর ও নববধূর জীবনে মধুরতম এই দিনে তাদের আতঙ্কিত করতে চান না তিনি, তারা যেন নির্ভয়ে তাদের মধুরাত উপভোগ করতে পারে, তা নিশ্চিত করাটা অবরোধ আরোপকারীদের সেনাপতি হিসেবে তার দায়িত্ব, অতএব মুসলিম বাহিনী যেন দুর্গ লক্ষ্য করে গোলা নিক্ষেপ বন্ধ রাখে।

তার সে নির্দেশ তাৎক্ষণিকভাবে পালিত হয়েছিল। নবদম্পতিও সে রাতে নিরুপদ্রবে কাটাতে পেরেছিলেন।

ছয়.

জেরুজালেম বিজয়ের পরে সালাহউদ্দীন পরাজিত খ্রিষ্টান সৈন্য ও তাদের পরিবার পরিজনদের মধ্যে যারা জেরুজালেম ছেড়ে যেতে চান, তাদের সময় বেঁধে দেন, নির্ধারিত সময়ের ভেতরে ইচ্ছা করলে তারা যেতে পারে। দলে দলে ইউরোপীয় খ্রিষ্টান ক্রুসেডার ও তাদের পরিবার পরিজন এ সুযোগে জেরুজালেম ছেড়ে ইউরোপের উদ্দেশে যাত্রা করলো।

এ সময় একদল ইউরোপিয়ান খ্রিষ্টান নারী এসে তার কাছে ফরিয়াদ জানালো যে, তাদের স্বামী বা সন্তানদের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, তাদের নিজেদের কোনো জায়গা নেই যে তারা সেখানে আশ্রয় নেবেন, দেখা শোনা বা ভরণ পোষণের মতও কেউ নেই, ফলে তারা খুবই অসহায় বোধ করছেন।

আগত এইসব নারীদের করুণ দুর্দশার কথা শুনে সুলতান সালাহউদ্দীন অত্যন্ত বেদনার্ত ও বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি তার জেনারেলদের নির্দেশ দিলেন বন্দী সৈন্যদের মধ্যে খোঁজ নিয়ে দেখতে এইসব নারীদের হারানো স্বজনকে পাওয়া যায় কি না দেখতে, পাওয়া গেলে তাদের যেন অনতিবিলম্বে মুক্তি দেয়া হয়।

তার নির্দেশ পালন করা হলো, বন্দী বেশ কিছু ইউরোপীয় খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের মুক্ত করে দেয়া হলো। আর যাদের কোনো হদিসই পাওয়া গেল না, তারা মৃত, এটা ধরে নিয়ে তাদের আত্মীয় স্বজনদের ক্ষতিপূরণ দেয়া হলো।

সাত.

আক্রা অবরোধের সময় (সেপ্টেম্বর, ১১৯২ সালের ঘটনা) ইংরেজ ক্রুসেডার রাজা রিচার্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন। সালাহউদ্দীন গুপ্তচর মারফত খবর পেয়ে আর দেরি না করে নিজের ব্যক্তিগত চিকিৎসককে রিচার্ডের কাছে পাঠিয়ে দেন তার চিকিৎসার জন্য।

এ সময় তিনি প্রতিদিন বিশেষ ব্যবস্থায় রাজা রিচার্ডের জন্য বরফ ও

www.pathagar.com

ডালিমের রস পাঠাতেন। এ দুটোই পথ্য হিসেবে চিকিৎসক রাজা রিচার্ডকে খেতে বলেছিলেন।

তার ভেতরে দুর্লভ এই মানবিক গুণগুলো সৃষ্টির পেছনে অবদান রেখেছিল তাঁর অগাধ পান্ডিত্য ও পারিবারিক পরিবেশ। তিনি শৈশবেই আল কুরআন হেফজ করেছিলেন। হাদিসশাস্ত্রেও ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। কুরআন ও সুন্নাহর তিনি কঠোর অনুগামী ছিলেন। সে প্রশিক্ষণ তিনি শৈশবে নিজের মা'র কাছে এবং এর পরে নিজ ওস্তাদ নুরুদ্দিন জিংকির কাছেই পেয়েছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের অর্থেই জ্ঞানপিয়াসী

সালাহউদ্দীনের ব্যক্তিগত লাইব্রেরিটা ছিল মিশরের সবচেয়ে বড় লাইব্রেরি। তার জীবনীলেখক ইহুদি ধর্মাবলম্বী ইবনে মায়মুনের বর্ণনা থেকে জানা যায়, উক্ত লাইব্রেরিতে কেবলমাত্র দর্শনের বইই ছিল এক হাজারের উপরে। কুরআন, হাদিস ছাড়াও সেখানে অ্যারিস্টটলের বই ছিল, ছিল ইবনে রুশদ এর বই। আর রাজির চিকিৎসাশাস্ত্রের বই ছিল। আরও মজার ব্যাপার হলো, ইতোমধ্যে ইসলাম ধর্মকে অবজ্ঞা কটাক্ষ ও বিরোধিতা করে যত বই রচিত হয়েছিল, যেগুলো পড়লে মুরতাদ হয়ে যাবে বলে বলা হতো, সেই সব বইগুলোও ছিল আলাদা আলমারিতে সাজানো, তিনি সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন।

আন্দালুসীয় পর্যটক, ঐতিহাসিক, পরিব্রাজক ও পন্ডিত আবু উবাইদ আল বাকরির (১০১৪-৯৪) লেখা 'সিরাতে ইবনে বাকরি' যে সিরাতগ্রন্থ নিয়ে সেকাল ছিল উত্তাল, প্রিয় রাসূল (সা:)-এর জীবন ও কর্ম নিয়ে মিথ্যা, অসত্য ও মনগড়া তথ্য দেয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল। প্রবল আপত্তির মুখে বাজার থেকে তুলে নেয়া হয়েছিল, সে বইটাও সালাহউদ্দীনের পাঠাগারে ছিল।

তিনি একই সাথে তিন পক্ষ থেকে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। এক দিকে যেমন শিয়া সম্প্রদায়, প্রায় তিনশত বৎসরের প্রবল ক্ষমতাশালী ফাতেমি খেলাফত ও সে ধারায় উজ্জীবিত মুসলিম মানস, অপর দিকে রয়েছে খোদ সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে কট্টর সুফি মতবাদে বিশ্বাসী গোষ্ঠী, যারা মসজিদে, ঘরে বা হুজরাতে বসে জিকির আজকারের পক্ষে, জিহাদের ব্যাপারে ব্যাপক অনীহা, প্রশাসন ও রাজনীতিতে যাদের আদৌ কোনো আগ্রহ নেই, সেই তারা।

আর তৃতীয় পক্ষে ছিল সারা ইউরোপ থেকে দলে দলে আগত উগ্র খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী সেনাদল, যারা পোপের আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার

www.pathagar.com

মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করতে আর সে সাথে পৃথিবীর বুক থেকে যিশুকে ঈশ্বর হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকারকারী মুসলিম সম্প্রদায়কে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার লক্ষ্যে!

এই তিন গোষ্ঠীকে একই সাথে মোকাবেলা করতে হয়েছে তার। আর সেটা তিনি অত্যন্ত সফলতার সাথেই করেছিলেন তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, উন্নত নৈতিক চরিত্র ও মানবিক গুণাবলীর মাধ্যমে।

www.pathagar.com

'বোম্বাইয়া'

মহারাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূল, আরব সাগরের তীরে ওয়াআসাই বা বাসাই (Vasai) নামক ছোট্ট এক পল্লিতে আশ্রয় নেয়া পুর্তগিজরা ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করে নৌ দস্যুতা চালিয়ে যেতে থাকে। ভারতের পশ্চিম উপকূল জুড়ে নৌজাহাজগুলো লুট করে পর্তুগিজ নৌ দস্যুদের লাভ হতো অনেক বেশি।

এর অন্যতম কারণ হলো, ভারত ছিল বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ধনী অঞ্চল এবং বিশ্বের একমাত্র হীরা উৎপন্নকারী দেশ (গোলকুন্ডা, হায়দ্রাবাদ)। ভারতীয় রাজা-রাজড়া, এমনকি, আমির-ওমরাহ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষদের মধ্যে সামর্থ্যবান প্রায় প্রত্যেকেই হীরা, মণি-মুক্তা, সোনা-দানা, জহরতের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আসক্ত ছিলেন।

এখানে এসব তো বটেই, এমনকি, বিস্ময়কর মসলিন, হাতির দাঁত, দামি ও দুস্প্রাপ্য সুগন্ধি, মসলা, কস্তুরি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সেগুন কাঠের একমাত্র বৃহত্তম উৎসস্থল বিদ্যমান (অপর কয়েকটি উৎসস্থল হলো; শ্রীলংকা, বার্মার আরাকান, ভিয়েতনামের কিছু এলাকা এবং জাভা দ্বীপপুঞ্জ)।

আর পুরো ভারতবর্ষজুড়ে ছোটখাটো নদী-নালা, খাল-বিলের উপস্থিতি থাকায় যে কোনে স্থান থেকে আহরিত রসদ ও পণ্য অতি সহজেই নৌপথে মাদ্রাজ বা অন্যান্য নৌবন্দরে আনা নেয়া করা যেতো।

তবে ভারতের সমস্যা হলো, তার কোনো শক্তিশালী নৌবহর নেই, যেটা ছিল পর্তুগিজদের। ফলে অতি সহজেই তারা ভারতের দক্ষিণ উপকূলজুড়ে আসন গেড়ে নিতে পেরেছে। সেখান থেকেই তারা তাদের দস্যুবৃত্তি চালিয়ে যেতে পেরেছে, বলা চলে, একরকম বিনা বাধায়। মাদ্রাজের উপকূল থেকে পর্তুগিজরা আরও উত্তরের দিকে অগ্রসর হয়ে, আরব সাগরের ধারে নারিকেল ঘেরা ছোট্ট দ্বীপে আসন গাড়ে, নাম দেয়া 'বন বাহিয়া'; নিরাপদ আবাস বা 'শান্তিধাম'। (India : A History. John Keay)

এই বন বাহিয়া থেকেই 'বোম্বাইয়া' এবং আরও পরে 'বোম্বাই' শব্দের উৎপত্তি। এটা একটা নেতিবাচক বিশেষণও বটে। 'বন বাহিয়া'য় যারা বাস করতো, সেই দস্যু প্রকৃতির পর্তুগিজরা ছিল অত্যন্ত নীচ ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির। নারী লোলুপ, রক্ত লোলুপ ও নৃশংস ছিল তাদের চরিত্র। স্থানীয় ভারতীয়রা কালক্রমে এদের কার্যক্রমে অতিষ্ঠ হয়ে এইসব বিদেশি তস্করদের ঘৃণা ও আতঙ্কভরে ডাকা শুরু করে 'বন বাহিয়া ওয়ালা' বলে।

কালক্রমে এই 'বন বাহিয়া ওয়ালা'রাই বোম্বাইয়্যাওয়ালা' বা সংক্ষেপে

www.pathagar.com

বোম্বাইয়্যা' বলে অভিহিত হতে থাকে। আজও পুরো ভারতবর্ষে উচ্ছৃঙ্খলতা বোঝাতে 'বোম্বাইয়্যা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়, যেমন বলা হয়; 'ছেলেটা একটা বোম্বাইয়্যা ধরনের বাজে ছেলে!'

যা হোক, ভারতের সম্পদ ও এখানে সে সম্পদ লুট করে নেয়ার অবারিত সুযোগ রয়েছে ঢের, এমন কথা পুরো ইউরোপ, বিশেষ করে, পশ্চিম ইউরোপজুড়ে প্রচার হয়ে গেলে পর্তুগিজদের মত ইংরেজ এবং ওদিক থেকে ডাচ (বর্তমান নেদারল্যান্ডস) জলদস্যুরা ছুটে আসে ভারত উপকূলে।

এই তিন ইউরোপীয় শক্তির মধ্যে তখন একরকম প্রকাশ্য প্রতিযোগিতাই শুরু হয়ে যায়, কার আগে কে কোথায় কোন বন্দরে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে? কে কার আগে কোন রাজা বা বাদশাহ বা সুলতানের সাথে মৈত্রীচুক্তি করে নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থ ও সুযোগ আদায় করে নেবে।

মাদ্রাজের গোয়ায় পর্তুগিজরা, কোচিন উপকূলে ডাচ এবং সুরাটে ইংরেজগণ নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে ব্যস্ত। ওদিকে ফরাসিরা ও আনাগোনা শুরু করেছে, ভারতের মাটিতে আসন গাড়ার জন্য।

এরকম একটা পর্যায়ে অনেকটা আতঙ্কিত ও চিন্তিত ইংরেজগণ তথা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার ইউরোপীয় প্রতিপক্ষ ডাচদের দৌরাত্ম্য খর্ব করতে, অপর অর্থে, ভারতবর্ষে নিজেদের ভাগ্য সন্ধান থেকে তাদের বিরত রাখতে প্রতিপক্ষ পর্তুগিজদের সাথে একটি মৈত্রী চুক্তিতে উপনীত হয়।

ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস এ সময় পর্তুগিজ রাজকন্যা ক্যাথরিনকে বিয়ে করলেন। সে সুবাদে ইংরেজ ও পর্তুগিজদের মধ্যে তখন সম্পর্কটা অনেকটা বন্ধুসুলভ।

পর্তুগিজরা ইংলিশ রাজা দ্বিতীয় চার্লসকে ক্যাথরিনের সাথে বিয়ের যৌতুক হিসেবে ভারতের পশ্চিম দক্ষিণ উপকূলে নতুন ও ক্ষুদ্র কিন্তু কৌশলগত অবস্থান বিচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই 'বন বাহিয়া' বন্দরটি দান করলো। (সূত্র : India : A History, John Keay, পৃ: ৩৭০)

আর রাজা দ্বিতীয় চার্লস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে উক্ত 'বন বাহিয়া' বন্দরটি প্রতি বৎসর সেপ্টেম্বর ৩০ তারিখ অবশ্যই স্বর্ণমুদ্রায় প্রদেয়, শর্তে বার্ষিক দশ পাউন্ড ভাড়ায় আজীবনের জন্য ভাড়া দেন (সূত্র: India; A History, John Keay, পৃ: ৩৭১)।

আর এ ভাবেই 'বনবাহিয়া' তথা বোম্বাই ইংরেজদের হাতে চলে আসে।

www.pathagar.com

কপালে টিপ, সিঁথির সিঁদুর ও প্রসঙ্গকথা

কপালে টিপ, বাঙালি, তথা আধুনিক বাঙালি নারীর প্রাত্যহিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। স্থান কাল আর পাত্র, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষ নারীরা পুরুষের তুলনায় সৌন্দর্য চর্চা করেন বেশি। আমাদের সমাজে আধুনিক বাঙালি নারীরা এ থেকে কোন মতেই পিছিয়ে নেই। বাঙালি নারীদের ক্ষেত্রে কপালে বড় একটা টিপ দেয়া, তার সৌন্দর্য চর্চার অন্যতম এক অনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে। পাক-ভারতীয় উপমহাদেশে এটা প্রায় প্রতিটি নারীর জন্যই এক রকম বাধ্যতামূলক বিষয় যেন। বাংলাদেশে তথাকথিত আধুনিক ও প্রগতিশীল নামধারী নারীরা তো কপালের মধ্যখানে ইয়া বড় একটা টিপ দেবেনই, এটা প্রমাণ করার জন্য যে, তিনি আধুনিক ও প্রগতিশীলা নারী।

আমাদের সমাজে এ প্রথাটা এলো কোথা হতে? এর উৎস খুঁজতে হলে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে ইতিহাসের পাতায়; বাল্মীকি যুগে।

বাল্মীকি যুগ হলো আজ হতে প্রায় ৯৫০০ হতে ১১৫০০ অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ:)-এর জন্মেরও প্রায় ৭৫০০ থেকে ৯৫০০ বৎসর আগের সময়কালটা ভারতীয় সমাজে বাল্মীকি যুগ বলে পরিচিত। ভারতীয় হিন্দু সমাজের বিকাশ ও হিন্দু সংস্কৃতির বিস্তার এ যুগের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ব্রাহ্মণ, পুরোহিত তথা হিন্দু ধর্মগুরুদের জন্য এ যুগটা ছিল এক স্বর্ণযুগ। এদের দ্বারা বৃহত্তর সমাজ তখন এক মারাত্মক বর্ণপ্রথার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েছিল।

ব্রাহ্মণরা তৎকালীন ভারতীয় সমাজকে ধর্মের নামে মোট চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে রেখেছিল; ব্রাহ্মণ, ক্ষৈত্রেয়, বৈশ্যেয় এবং শুদ্র (আজও তাই-ই আছে)। বিভাজিত এ সমাজে ব্রাহ্মণরা নিজেদেরকে সর্বোচ্চ শ্রেণিতে বসিয়েছিল, তাও সেই ধর্মের নামেই। এটা তাদের জন্য ছিল প্রকৃত অর্থেই স্বর্ণযুগ।

ভারতীয় হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথা এই আধুনিক যুগেও বিদ্যমান। আর আজ হতে হাজার হাজার বৎসর পূর্বেকার সমাজে এটা কতটা চরমতম পর্যায়ে ছিল, সেটা আমাদের পক্ষে কল্পনাও করা সম্ভব নয়।

ব্রাহ্মণরা উচ্চ শ্রেণির, তারা ঈশ্বরের অতি নিকটজন, পূত পবিত্র। পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে তারা কপালে সাদা তিলক (চন্দন তিলক) দিতেন। এখনও দেন।

ক্ষৈত্রেয় হলো যোদ্ধা শ্রেণি, তাদেরকে বীর হিসেবে গণ্য করা হতো। ক্ষিপ্রতা, হিংস্রতা ও সাহসের প্রতীক হিসেবে তারা কপালে লাল টিপ দিতো।

www.pathagar.com

বৈশ্যেয় শ্রেণির লোকজন হলো ব্যবসায়ী, পেশাই হলো ব্যবসা। এরা কপালে হলুদ রঙের টিপ ব্যবহার করতো।
আর সমাজে সবচেয়ে নীচু শ্রেণির মানুষ হলো শূদ্ররা। এরা হলো অপবিত্র, হীন, নীচ। এই হীনতা, বর্বরতা এবং নীচুতার প্রতীক হিসেবে তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল কালো রঙের টিপ। তারা কপালে কালো টিপ ব্যবহার করতে বাধ্য হতো।
নারীদের মধ্যেও ভিন্ন মাত্রার শ্রেণিভেদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। শ্রেণিভেদ অনুসারে তাদের বেলাতেও এই টিপ ব্যবহারে একটু ভিন্নতা ছিল।
সে যুগে নিম্ন বংশের নারীদের উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ ও ঠাকুর কিংবা মন্দিরের পুরোহিতের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হতো। এটা করা হতো ধর্মের নামে, ভগবানের উদ্দেশ্যে, মন্দিরের সেবাদাসী হিসেবে। ভগবানের সেবা করার জন্য উৎসর্গকৃত হলেও প্রকতৃপক্ষে তারা মন্দিরের পুরোহিতদের ভোগের উপদান ছিল মাত্র। এরা ছিল পাবলিক প্রোপার্টি।
উচ্চ বংশে যে সব নারী জন্মাতো, ঠাকুররা কিন্তু সে সব নারীদেরকে মন্দিরে ভগবানের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতো না! তাদের বিয়ে হতো। তারা ঠিকই ঘর সংসার করতো, তবে কোন নারীর স্বামী তার জীবদ্দশায় মরলে, অর্থাৎ স্ত্রীর আগে স্বামী মরলে সদ্য বিধবা এইসব নারীর কেউ কোন দায়িত্ব নিতো না বলে, তাদেরকে মৃত স্বামীর সাথে চিতায় জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হতো। সতীদাহ প্রথা নাম ছিল তার। আর এটাও করা হতো সেই ধর্মের নামেই!
যারা উচ্চ বংশের, যারা বিবাহিতা, যারা কোন পুরুষের স্বীকৃত স্ত্রী, তাদেরকে চিহ্নিত করার জন্য সেই সব নারীদের কপালে বা সিঁথিতে সিঁদুর ব্যবহরের বিধি চালু করা হয়।
মন্দিরে ভগবানের উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত সেবাদাসীরা ছিল পাবলিক প্রোপার্টির মত, সেটা আগেই বলেছি। পুরো ভারতীয় হিন্দু সমাজে হাজার হাজার এইসব নারীদের মুখ চিনে রাখা সবার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, পাবলিক প্রোপার্টি মনে করে কখনও কোন পুরোহিত ঠাকুর যেন আবার উচ্চবংশের কোন নারীকে ভোগের জন্য আহ্বান করে না বসে, সে জন্য তারা এইসব নারীদের চিহ্নিত করার উপায় বের করে।
সেটা হলো, যে সব নারীকে ভগবানের উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত করা হয়েছে, যেহেতু ভগবানের প্রতিনিধি হিসেবে মন্দিরের পুরোহিত, ঠাকুরগণ তাদের সেবা নিতে ও তাদের ভোগ করতে পারবে, তাই তাদের চিনতে যেন সুবিধা হয়, সে লক্ষ্যে এই সব নরীদের কপালে টিপ দেয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে।
যুগ বদলেছে, বদলেছে মানুষের রুচি। পরিবর্তন ও পরিমার্জন হয়েছে মন

www.pathagar.com

ও মনন, বোধ ও বিশ্বাস। এক সময় সমাজের পতিতা শ্রেণির নারীদের চিহ্ন; কপালের টিপ- আজকের এই আধুনিক ও আলোকিত (!) যুগে এসে আমাদের নারীরা নির্দ্বিধায় পালন করে যাচ্ছেন! এটা এখন নারীর সৌন্দর্য বর্ধনের একটা উপলক্ষ মাত্র। এভাবে সমাজ বদলায়, বদলায় জীবন ও সংস্কৃতিও।

www.pathagar.com

মাছির চোখ ও বই পড়া

মাছির চোখ বলে কথা, মাছি উপরে নিচে ডানে বামে, একই সাথে সবদিকে সে দেখতে পায়। তার চোখ সৃষ্টির এক অপার বিস্ময়! মাছির চোখ হলো Compound Eye 'কম্পাউন্ড আই'। একটি মাছির কয়টি চোখ থাকে? বা কয় জোড়া? আমরা অনেকেই হয়তো কল্পনাও করতে পারি না যে, একটি মাছির প্রায় চার হাজার চোখ থাকে, বা তার চোখের চার হাজার স্বতন্ত্র অংশ রয়েছে, এগুলো এক একটিকে বলা হয় Ommatidia। এর প্রতিটিই একটি করে স্বতন্ত্র চোখ।

দৃশ্যমান বস্তু দেখার পরে তার প্রতি সাড়া দেয়ার একটা প্রবণতা প্রতিটি প্রাণীরই থাকে। আমরা মানুষও তাই করি। মানুষের চোখের চেয়ে মাছির চোখ পাঁচগুণ বেশি দ্রুত মুভ করতে পারে। শুধু তাই নয়, বিশ্বের প্রাণিকুলের মধ্যে মাছিই সবচেয়ে দ্রুত তার দৃষ্টিগোচর হওয়া বস্তুর প্রতি সাড়া দেয় (Fastest Visual response)।

এ কারণেই মাছিকে ধরা মুশকিল। আপনি তাকে ধরতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন, আপনার শরীরের প্রতিটি মুভমেন্ট মাছি দেখতে পাচ্ছে, সময়মত সাবধান হচ্ছে এবং উড়াল দিচ্ছে। তার পরেও কিন্তু মাছিকে ধরা সম্ভব। মাছি পরাস্ত হয় গতির কাছে। সে টের পেয়ে উড়াল দিচ্ছে, তা সত্ত্বেও আপনি যদি তার গতির চেয়ে বেশি গতিতে হাত চালিয়ে তাকে ধরতে চান, তা হলে পারবেন। মাছি নিয়ে কড়চা আপাতত এখানে থাকুক। আসুন, আমরা ভিন্ন একটা বিষয়ে দুই কথা বলি।

কোন একজন পশ্চিমা পণ্ডিত খুব মূল্যবান কথা বলেছিলেন একবার, বই পড়া নিয়ে। তিনি এক একটি বইকে এক একটি চোখের সাথে তুলনা করে বলেছিলেন; আপনি যদি একটা বই পড়েন তার মানে হলো আপনি নতুন একটা চোখ সংযোজন করে নিচ্ছেন নিজের জন্য। আপনার দৃষ্টিভঙ্গি ও দৃষ্টিশক্তি প্রখর হবে, তীক্ষ্ণ হবে। আপনি অনেক দূর দেখতে পাবেন, অনেক কিছু দেখতে পাবেন।

'অনেক কিছু' আর 'অনেক দূর' দুটো আপেক্ষিক বাক্য, অতি গভীর অর্থবোধক বাক্য। এর অর্থ ও ভাব পুরোটা উপলব্ধি করা দরকার। অনেক কিছু বলতে আমরা বলতে চাচ্ছি, আপনি আপনার সামনে ঘটনা বা ঘটনাসমূহ যা আর দশজন দেখছেন, যেভাবে দেখছেন, তার চেয়েও বেশি কিছু দেখতে পাবেন, যেভাবে ঘটছে, তার বাইরেও ঐ একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা দেখতে পাবেন। এর রেশ, পরিণতি ও ভবিষ্যৎটাও দেখতে

www.pathagar.com

পাবেন। আপনার ইতিহাস জ্ঞান, দর্শনের জ্ঞান, সমাজ নিয়ে চেতনাবোধ আপনাকে প্রতিটি ঘটনার দৃশ্যমান রূপের বাইরেও বা তার আড়ালে রয়ে যাওয়া ঘটনা ও তার রেশ বা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দেখতে বা উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে। সে রকম সক্ষমতা ও শক্তি আপনাকে জোগান দেবে।

ঠিক একইভাবে 'অনেক দূর' বলতে আমরা প্রকৃত অর্থে ফুট, গজ বা মাইলের দূরত্ব বোঝাচ্ছি না। বরং ভবিষ্যৎ কাল বা সময়ের দূরত্ব বোঝাচ্ছি। নিকট অতীতের ইতিহাস থেকে একটা উদাহরণ দেই।

১৯০৭ সালে প্রথমবারের মত জেরুজালেম সফর এবং সেখানে Palestine Land Development Company নামে একটি ব্যবসায়িক কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে। এই কোম্পানিটি ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জেনেভা, সুইজারল্যান্ডসহ বিশ্বের অনেক দেশেই ধনাঢ্য ইহুদিদের দেয়া অর্থে বাজারদরের চেয়ে অনেক উচ্চমূল্য দিয়ে প্যালেস্টাইনে গরিব ফিলিস্তিনি আরবদের কাছ থেকে জমি ক্রয় করে সেই সব জমিতে উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার মাধ্যমে কৃষিপ্রকল্প গ্রহণ করে। বর্তমান তেল আবিবের একটি পাহাড় একইভাবে কিনে নিয়ে সেখানেই গড়ে তোলা হয় আধুনিক কৃষিখামার!

জেরুজালেমের তখনকার গ্র্যান্ড মুফতি আমিন আল হুসাইনি আমেরিকান, ব্রিটিশ, রাশিয়ান ও ইউরোপিয়ান ইহুদিদের এ ধরনের তৎপরতার পেছনে অশুভ ষড়যন্ত্রটা উপলব্ধি করেন। তিনি তাদের পরিকল্পনা আঁচ করে ফিলিস্তিনের আরব অধিবাসীদের কাছে বার বার মিনতি করেন, তারা যেন ইউরোপীয় ইহুদিদের কাছে জমি বিক্রি না করে, তারা যতই চড়া দাম দিক না কেন। সাধারণ ফিলিস্তিন আরবদের একটা বড় অংশই তার এ কথায় কান দেয়নি। দুই গুণ, কখনও কখনও তিনগুণ বেশি দাম পেয়ে তারা জমি বিক্রি করে দেয় ইহুদিদের কাছে। সেই সব জমিতে ইউরোপ থেকে দলে দলে ইহুদিরা এসে বসতি স্থাপন করে।

আর এর পরিণতি কী হয়েছে সেটা আজ আর কাউকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে না। সেদিনকার সেই কৃষিখামারই আজ ইসরাইলের রাজধানী; তেল আবিব!

মুফতি হুসাইনি তার জ্ঞান, প্রজ্ঞা আর দূরদর্শিতার কারণে সেই সেদিনই ইহুদিদের ষড়যন্ত্র, তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বুঝে উঠতে পেরেছিলেন, আর সেটাই বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে আপামর ফিলিস্তিনি আরব জনতা।

এই যে জ্ঞান, প্রজ্ঞা আর দূরদর্শিতা, এগুলো হলো আপনার সেই চোখ, অন্তরের চোখ অন্তর্দৃষ্টি, যা মাছির চার হাজার চোখের চেয়েও ক্ষমতাসম্পন্ন

www.pathagar.com

ও শক্তিশালী। আপনার নিজের ভেতরে এই জ্ঞান, এই প্রজ্ঞা আর দূরদর্শিতা সৃষ্টি করবার একটা মাত্র উপায় হলো, জ্ঞান চর্চা করা।

এর জন্য বই পড়ুন। সিরিয়াস বই, প্রেমের রোমান্টিক বই পড়তে চাইলে তাও পড়তে পারেন। তবে নিজের ভেতরে সমাজ ও বিশ্বকে প্রভাবিত করার মত জ্ঞান, সেই মানের প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা জন্মাতে চাইলে দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ, আত্মজীবনী এরকম সিরিয়াস বই পড়তে হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

একটি বই পড়বেন, তার মানে হলো, আপনার ভেতরে আরও একটি চোখ সংযোজিত হলো; আপনার জ্ঞান যেমন বাড়বে, তেমনি আপনার ভেতরে অনেক দূর অতীত ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করে অনাগত ভবিষ্যৎকে দেখার যোগ্যতা সৃষ্টি হলো।

কেবল তাই নয়। বেশি বেশি সিরিয়াস বই পড়ার কারণে আপনার ভেতরে যে জ্ঞান সৃষ্টি হচ্ছে, তার উপরে ভিত্তি করেই তৈরি হবে প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা হলো; যথাসময়ে জ্ঞানের যথাযথ ব্যবহারে ব্যক্তির কৌশল ও দক্ষতা।

অর্থাৎ ত্বরিতগতিতে যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে পারা। এটা একটা দুর্লভ গুণ। জ্ঞান থাকলেই এই গুণটা ব্যক্তির ভেতরে থাকবে তেমনটা নয়, তবে যথাযথ জ্ঞানের যথাযথ চর্চা ও নিরন্তর ভাবনায় প্রজ্ঞার জন্ম নিতে পারে। জ্ঞানের সাথে সাথে আপনার ভেতরে চিন্তার গতি; প্রত্যুৎপন্নমতিতা যদি থাকে, তবে আপনি অনেকটাই অজেয়।

অতএব নিজের জীবন নিজের পরিবার ও সমাজ এবং এই দেশকে প্রজ্ঞাময় নেতৃত্ব দিতে আপনাকে দরকার। একজন দক্ষ নেতা হয়ে গড়ে উঠুন, অতএব বেশি বেশি বই পড়ুন, আপনার অন্তর্দৃষ্টিকে প্রখর করুন, দিগন্তজুড়ে প্রসারিত করুন।

www.pathagar.com

মজলুমের সাহায্যকারীগণ অবশ্যই পুরস্কৃত হন–

সেলজুক সুলতান আলাউদ্দিনের শাসনকাল চলছে। একাদশ শতাব্দীতে মোঙ্গল তুর্কিদের একটা বিরাট অংশ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। তারাই সেলজুকদের পূর্বপুরুষ। নিজেদের দক্ষতা ও যোগ্যতা বলে তারা অতি সত্বরই একটি নতুন ইসলামি সালাতানাত গড়ে তুললো। তুর্কি সেলজুক সুলতানরা ইতিহাসে নিজেদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

এদেরই একজন কোনিয়ার সুলতান আলাউদ্দীন। কোনিয়া বর্তমান তুরস্কের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের একটা প্রদেশ। তুরস্কের কোনিয়ায় আজও তার নামে সুলতান আলাউদ্দীন মসজিদ বিদ্যমান রয়েছে। সুলতান আলাউদ্দীন তার সাম্রাজ্যের দূরবর্তী এক জনপদে আর এক মোঙ্গল যাযাবর বাহিনীর বিরুদ্ধে তার একটি সেনাদল পাঠিয়েছেন অভিযানে।

কোনিয়া থেকে কয়েকশত কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে তার রাজ্যের একেবারে সীমান্তের শেষপ্রান্তে দীর্ঘদিন সে যুদ্ধ চলে আসছে কিন্তু বিদ্রোহীদের সমূলে দমন করা সম্ভবপর হচ্ছে না। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা ও স্থিতির প্রতি এটা যেমন হুমকি হিসেবে বিদ্যমান ছিল তেমনি রাজ্যের আর্থিক খাতের উপরে একটা বাড়তি চাপ হিসেবে বিরাজ করতো। সুলতানের জন্যও তেমনি বিষয়টা একটা মানসিক উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে আছে দীর্ঘদিন ধরে।

ঠিক এরকম একটা সময়ে প্রায় চারশত অনুসারী নিয়ে ভাগ্যের সন্ধানে একটা ছোট্ট মোঙ্গল তুর্কিবাহিনী একই এলাকায় চষে বেড়াচ্ছে। সে এলাকাও সেই একই সুলতান; সুলতান আলাউদ্দীনের রাজ্যেরই এলাকা। এই চারশত মোঙ্গল বাহিনীর নেতা ছিলেন যে যুবক, তার নাম ছিল এরতোঘরুল। প্রচণ্ড সাহসী, দক্ষ যোদ্ধা ও দূরদর্শী হিসেবে যুবকটি তার বাহিনীর কাছে সম্মান আর শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তার বাহিনীর প্রতিটি সদস্য এক বাক্যে তার নির্দেশ অকপটে মেনে নিতে, এমনকি, তার জন্য নিজেদের জীবন বাজি রাখতেও দ্বিধা করতো না।

বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে পড়ে ক্ষুদ্র এই বাহিনী নিয়ে এরতোঘরুল পড়লেন এক মহাফাঁপড়ে। নিজের বাহিনীকে এ ধরনের সংঘাত থেকে বাঁচিয়ে নিরপেক্ষ থাকতে পারলেই বোধ হয় ভালো হতো, কিন্তু সেটা শত চেষ্টা করেও সম্ভব হচ্ছে না। সমকালীন সমাজব্যবস্থা ও বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে নিরপেক্ষ থাকার কোনো সুযোগ নেই, ছিলও না।

সংঘাতে যদি কোনো পক্ষে জড়াতেই হয়, তা হলে স্বাভাবিক বুদ্ধিতে এটাই

www.pathagar.com

তো বোধগম্য যে, বিবদমান দুটি পক্ষের মধ্যে যে পক্ষটি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী, আপাতদৃষ্টি বিচারে যে পক্ষটি যুদ্ধে সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছেন, যাদের বিজয়ের সম্ভাবনা বেশি, তাদের সাথেই যোগ দেবে। নিজেদের মাতৃভূমি থেকে বহু শত মাইল দূরের মাটিতে পরাজয়ের ঝুঁকি এড়িয়ে বিজয়ী শক্তির সাথে জয়ের আনন্দ ও গৌরব ভাগাভাগির সাথে সাথে যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি পাওয়ার যেমন সম্ভাবনা রয়েছে তেমনি নিজেদের শক্তিমত্তাকে প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠিত করারও যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

এরতোঘরুল পুরো বিষয় ও সম্ভাবনাকে গভীর মনোযোগের সাথে ভেবে দেখলেন। যতটা সম্ভব বিবদমান দু'টি পক্ষের পরিচয় ও সংঘাতের কারণও জানার চেষ্টা করলেন। এর পরে তার কাছে মনে হলো পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে যে পক্ষটি, সে পক্ষই অন্যায়ভাবে আক্রান্ত হয়েছে। বিবদমান দু'টি পক্ষের মধ্যে তারাই আসলে সত্যনিষ্ঠ। এটা বুঝতে পারার পরে আর কোনো রকম চিন্তা ভাবনা না করেই তিনি তার চারশত অনুসারীদের নির্দেশ দিলেন পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে যে দলটি, সেই দলটির হয়ে যুদ্ধে নামতে। যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল সহসাই। যারা প্রায় হেরেই গিয়েছিল, সেই তারাই অপ্রত্যাশিতভাবে সাহায্য পেয়ে যুদ্ধে অতি সহজেই জিতে গেল।

সুলতান আলাউদ্দীনের বাহিনী বিজয়ী হলো। এ খবর পেয়ে সুলতান আলাউদ্দীন তার সেনাপতির কাছ থেকে বিস্তারিত খোঁজ খবর নিলেন এবং এরতোঘরুলকে পুরস্কৃত করতে চাইলেন।

সুলতান আলাউদ্দিন তার সভাসদ ও সেনাপতিদের সাথে পরামর্শ করে তার রাজ্যের একেবারে পশ্চিম সীমান্ত এলাকা, যা বার বার তার প্রতিবেশী গ্রিক শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং যেখানে নিজেদের কর্তৃত্ব ও দখলদারিত্ব টিকিয়ে রাখাটা খুবই কষ্টকর, সে জায়গাটা এই চারশত যোদ্ধার বাহিনীর নেতা এরতোঘরুলকে শাসন করার জন্য দিলেন।

কোনিয়ার কাছে যে এলাকাটিতে চারশত যোদ্ধার এই বাহিনী বসতি গাড়ে, সে অঞ্চলের নাম ছিল 'সোগুত' (Sogut)। এই জায়গাটাই হলো একালের আধুনিক তুরস্কের মেগাসিটি; এসকেশেহর (Eskisehir)। তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারা থেকে প্রায় দুইশত আশি কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। অতি আধুনিক একটি শহর। পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় শহরটি এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য।

এলাকাটির অবস্থান ছিল বাইজান্টাইন ও সেলজুক সাম্রাজ্যের একেবারে সীমান্তবর্তী এলাকায়। প্রায়ই খ্রিষ্টবাদী বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে সেলজুক তুর্কি সাম্রাজ্যের ভেতরে তাদের অভিযান

www.pathagar.com

পরিচালনা করে লুটতরাজ'সহ ধ্বংসযজ্ঞ চালাতো। উভয় সাম্রাজ্যের ভেতরে এক স্থায়ী বৈরিতার একটা কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিষয়টা।

কোনিয়ার কাছে সংঘটিত যুদ্ধে অপ্রত্যাশিতভাবে এরতোঘরুল বাহিনীর কাছ থেকে সময়োচিত সাহায্য পেয়ে সুলতান আলাউদ্দিন যে কেবল সাময়িক উপকৃত হলেন তাই নয়, বিচক্ষণ সুলতান উক্ত যুদ্ধে এরতোঘরুলের সাহসী ভূমিকা, যুদ্ধের কলাকৌশল ও সৈন্য পরিচালনায় তার দক্ষতা এবং অধীনস্থ সেনাবাহিনীর উপরে তার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণের কথা শুনে অভিভূত হন।

সুলতান আলাউদ্দিন এরতোঘরুল ও তার বাহিনীকে পুরস্কৃত করার আড়ালে তাদের নিজ সাম্রাজ্যের জন্য কাজে লাগাতে চাইলেন। তার ধারণা এরাই হলো উপযুক্ত বাহিনী যারা বাইজান্টাইন বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে পারবে। এ চিন্তা থেকেই তিনি এরতোঘরুলকে তার সীমান্তবর্তী এলাকায় বসতি গাড়ার অনুমতি দিলেন এবং সেই সাথে তিনি তাকে অনেকটা স্বায়ত্তশাসনের সুযোগও দেন।

এরতোঘরুল কেবল যে একজন সৈনিক হিসেবেই দক্ষ ছিলেন, তাই নয়, বরং তিনি একজন প্রশাসক হিসেবেও যে ছিলেন বিচক্ষণ ও সেরা, তার প্রমাণও রাখছেন অচিরেই তার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা, সাম্য, সুবিচার, উন্নতি ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

ইতোমধ্যে বাইজান্টাইন খ্রিকরা বরাবরের মতই আরও একবার আক্রমণ চালালো। কিন্তু এবারে তাদের মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে গেল এরতোঘরুল বাহিনী। এ বাহিনী যে কেবল গ্রিক খ্রিষ্টান বাহিনীর আক্রমণ রুখে দিলো তাই নয়, বরং তাদের আত্মরক্ষার এই অভিযানকে তারা ঠেলে খোদ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের মধ্যে নিয়ে গেল এবং একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিজেদের দখলে নিয়ে সেখানে এরতোঘরুল তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন।

সুলতান আলাউদ্দিন অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য থেকে অধিকৃত অংশটিও এরতোঘরুলের নিয়ন্ত্রণে দিলেন। আর এভাবেই খ্রিষ্টবাদী বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য প্রতিবেশী মুসলিম সেলজুক সাম্রাজ্যের সাথে আগ বাড়িয়ে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। আর ভাগ্যের সন্ধানে মধ্য এশিয়া থেকে মাত্র চারশত যোদ্ধা নিয়ে বেরিয়ে আসা এরতোঘরুল নিজের সততা, প্রজ্ঞা, উন্নত মানসিক সত্তা ও চরিত্রমাধুর্য, সদাচার আর দক্ষতা দিয়ে প্রচণ্ড এক বৈরী পরিবেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেন।

তার ইনসাফভিত্তিক শাসনব্যবস্থা তাকে অচিরেই এমন এক অচিন্তনীয়, অভাবিত ও অপ্রত্যাশিত পুরস্কারে পুরস্কৃত করলো যে, তিনি ও তার পরবর্তী বংশধররা কোনদিন কল্পনাও করেননি তেমনভাবে পুরস্কৃত হওয়ার।

www.pathagar.com

তারাই প্রতিষ্ঠা করে ছাড়লেন ওসমানীয় খেলাফত, পুরো বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য তো বটেই, এমনকি পুরো মুসলিম বিশ্ব এবং ইউরোপেরও এক বিরাট অংশ যার পদতলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল।

আর এই বিরাট ঐতিহাসিক অর্জনের সূত্রপাতটি হয়েছিল এরতোঘরুল কর্তৃক অত্যন্ত ছোট্ট কিন্তু অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োচিত একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে, সেটি হলো, মজলুমের পাশে দাঁড়ানো, সকল প্রকার লোকসান ও বিপদের ঝুঁকি সত্ত্বেও সত্যের পক্ষে অবস্থান নেয়া।

ইতিহাস আমাদেরকে শিক্ষা দেয়; মজলুমের পক্ষে, সত্যপন্থীদের পক্ষে দাঁড়িয়ে যাওয়া ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে আল্লাহ অবশ্যই উপযুক্তভাবে পুরস্কৃত করেন। নিপীড়িত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সাহায্যে যারা আত্মনিয়োগ করেন, তারা অবশ্যই পুরস্কৃত হন। খোদ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের সম্মান, যশ খ্যাতি উন্নত জীবন ও প্রভাব প্রতিপত্তি দিয়ে সম্মানিত করেন। এরতোঘরুলের জীবনীই সে ঘটনার স্বাক্ষী।

www.pathagar.com

ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করুন নিরাপদ থাকবেন

১৮৫২ সালের ২রা এপ্রিল, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত দুইটা, দিল্লির লাল কেল্লার বিশাল লাহোর গেট দিয়ে এগারো বৎসর বয়সী যুবরাজ জওয়ান বখত-এর বিয়ের বরযাত্রী বের হলো। সে এক বিশাল লাট বহর। কি ছিল না সে বহরে? নবাবী জৌলুসের যেন কোন কমতি না হয় সে প্রচেষ্টার বিন্দুমাত্র বাকি রাখেননি রানী জিনাত মহল।

সেই ৩১ শে মার্চ সকালে মালাগড় থেকে জিনাত মহলের ভাই, আর আসন্ন শুভ-বিবাহের দশ বৎসর বয়সী কনে নওয়াব শাহজামানী বেগমের বাবা ওয়ালিদাদ খানের বাড়ি হতে বরের জন্য বিরাট বিরাট সোনার থালায় সাজানো উপঢৌকন আসার পর থেকেই পুরো রাজপ্রাসাদ জুড়ে বিয়ের আনন্দ; নাচ-গান, বাজনা, খানা পিনা শুরু হয়েছে, আর তা বিরতিহীনভাবে চলছে। বিখ্যাত কবি গালিব'সহ প্রায় পঞ্চাশজন নামকরা কবি দিন রাত কবিতার আসর চালিয়ে যাচ্ছে, নর্তকীরা নেচে চলেছে, শিল্পীরা সুর করে গান গাইছে।

দিল্লির প্রচণ্ড গরমে দিনের বেলায় উত্তপ্ত সূর্যের নিচে রেশমি কাপড়ের ভারী পোশাক পরা নবাব পরিবারের সদস্যগণসহ বর যেন ঘামে ভিজে না যান, তা নিশ্চিত করতেই এই রাত দুটোর সময় বরযাত্রী বের হয়েছে লাট বহর সহ।

রাত্রি বেলা তো কী হয়েছে? সামনে পেছনে মশালবাহী শান্ত্রী, ছয়টি হাতির পিঠে স্বর্ণের কারুকাজ করা রেশমি কাপড় দিয়ে মোড়া হাওদা বসানো হয়েছে। মাথার উপরে প্রকাণ্ড ছাতা, একটু পরেই সূর্য উঠলে যেন কারো গায়েই রোদ না লাগে, তার জন্য। সেই ছাতার মধ্যেও রয়েছে নবাবী জৌলুসের ছাপ। মূল্যবান রেশমি কাপড়ের উপরে স্বর্ণের সূক্ষ্ম কারুকাজ আর তারই মাঝে বসানো হয়েছে হীরাসহ রক্তলাল রুবী পাথর।

বরসহ নবাবদের পরণে মহামূল্যবান পাথর বসানো জরিদার শেরওয়ানি, স্বর্ণের কারুকাজ আর হিরা-চুন্নির ঝকমকে রং চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। পাগড়ির উপরে সামনের দিকে এমন কুশলী হাতে লাল রুবী বসানো হয়েছে যে, দূর থেকেও জ্বলজ্বলে সেই পাথরের রূপ ছিটকে এসে দর্শকের চোখে পড়ে, নজর এড়ানো যায় না চাইলেও।

এক হাতির পিঠে হাওদার উপরে আটাত্তর বৎসর বয়সী বৃদ্ধ নবাব বাহাদুর শাহ জাফর তার দেহরক্ষী পরিবেষ্টিতাবস্থায় আসীন। শরীরে বার্ধক্য ও

www.pathagar.com

ক্লান্তির ছাপ ফুটে উঠার পাশাপাশি তাঁর কপালে চিন্তার রেখা সুস্পষ্ট।
হবেই না বা কেন? প্রবল প্রতাপশালী মোগল সাম্রাজ্য আর নেই। ১৭৫৭ সালে বাংলা হাতছাড়া হওয়ার পরে এক এক করে ১৭৯৯ সালে মহিশুরের টিপু, ১৮০৩ সালে মারাঠারা আর ১৮৪৯ সালে শিখদের পরাজিত করে ইংরেজরা পুরো ভারত গ্রাস করে খোদ দিল্লিতে এসে বসেছে!
দিল্লির লাল কেল্লার নবাব মহল ছাড়া আর কোনো এলাকার উপরে জাফর শাহের কর্তৃত্ব নেই। লাল কেল্লার ভেতরের আলিশান প্রাসাদে নবাব বাস করেন বটে, তবে সেটা অনেকটা বন্দিত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। নবাবের সাথে বাইরে থেকে কেউ দেখা করতে এলে কিংবা নবাব বাহাদুর শাহ জাফরও যদি কাউকে ডেকে পাঠান, তবে তাকেও কোম্পানির ইংরেজ আবাসিক দূত Sir Thomas Metcalfe'র অনুমতি নিতে হয়।
নবাব জাফর তার নিজের জায়গির থেকে প্রাপ্ত অর্থও খরচ করতে পারেন না এই Thomas Metcalfe'র অনুমতি ব্যতিরেকে! তিনি নিজের কর্মচারীদের বেতন দিতে পারেন না, সে কারণে বহু কর্মচারীকে চাকরি থেকে বিদেয় করতেও হয়েছে। সৈন্যদের বেতনও ঠিক মত দিতে পারেন না দেখে বহু রেজিমেন্টও ভেঙে দিতে হয়েছে। এমন আর্থিক দুরবস্থার মধ্যেও এমন বিলাসী একটা বিয়ের আয়োজন সত্যিই বড় বেমানান ঠেকে বৈকি।
কিন্তু নবাব নিরুপায়। বেগম জিনাত মহলের কথাই চূড়ান্ত কথা, তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। বেগম জিনাত মহল যখন নবাব বাহাদুর শাহের জীবনে আসেন রানী হয়ে তখন তার বয়স সবেমাত্র উনিশ বৎসর, আর নবাবের বয়স ছিল চৌষট্টি বৎসর। উনিশ বৎসরের জিনাত মহল রানী হয়ে এসে নবাবের স্ত্রী রানী তাজমহলকে কৌশলে নবাবের কাছ থেকে দূরে সরিয়েছেন এমনকি জেলও খাটিয়েছেন। নবাবের পাঁচ স্ত্রীর মধ্যে প্রথম ও সর্বশেষ স্ত্রীর মধ্যে এই যে দ্বন্দ্ব তা আর কোনোদিনই থামেনি। নবাবের ষোল পুত্র আর একত্রিশ জন কন্যা, মোট ৪৭ জন সন্তান-সন্ততির মধ্যে রানী তাজমহল চেয়েছেন বড় সন্তান নবাবের উত্তরসূরি হিসেবে সিংহাসনে বসুক, কিন্তু রানী জিনাত মহল মানতে নারাজ। তার একই কথা, তার গর্ভের সন্তান, জওয়ান বখতই পরবর্তী নবাব হবে।
সকলেরই ধারণা ছিল নবাবের বড় ছেলে মির্জা ফখরুই হবেন পরবর্তী নবাব। কিন্তু বেগম জিনাত মহলের একচ্ছত্র প্রভাবে শেষ পর্যন্ত নবাব তার মত বদলে ষোল ছেলের পনেরোতম পুত্রকেই নিজের উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা করলেন। নবাবের যতটা না তাড়াহুড়ো ছিল তার চেয়ে বেশি তাড়াহুড়ো ছিল বেগম জিনাত মহলের।

www.pathagar.com

বুড়ো নবাব কখন তার মত পাল্টান বা কখন তার শরীরের অবস্থা কোন দিকে মোড় নেয়, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই, তাই মাত্র এগারো বৎসরের ছেলেকেই উত্তরাধিকার ঘোষণা ও বিয়ে দিয়ে দিল্লির সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরাধিকার বানাতে উঠে পড়ে লাগেন। এর জন্য যে বিরাট অর্থের দরকার ছিল, তার জোগান দেয়ার ক্ষমতা জাফর শাহের না থাকলে বেগম জিনাত মহল সে সবের তোয়াক্কা করেন নি। তিনি বিশ্বস্ত উজির মাহবুব আলী খানের সাহায্যে দিল্লির প্রত্যেক শেঠের নিকট থেকে উচ্চ সুদে টাকা কর্জ আনিয়েছেন। যেখানে কর্জ মেলেনি সেখানে প্রয়োজনে মাহবুব আলী খান জোর খাটিয়েছেন অর্থ আদায়ে। শেষ পর্যন্ত টাকার জোগাড়ও হয়েছে।

নির্ধারিত দিনে বিয়ের বরযাত্রী বহরে বড় ছেলে মির্জা ফখরু না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও তার শ্বশুর ধুরন্ধর মির্জা ইলাহী বখশের পরামর্শে শেষ পর্যন্ত বরযাত্রী হিসেবে বাপ ভাইয়ের সাথে শামিল হয়।

মির্জা ইলাহী বখশ নিজ জামাতা, জাফর শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নবাবী হতে বঞ্চিত করাটা মেনে নেননি। তিনিই নবাবপুত্র মির্জা ফখরুর সাথে যোগযোগ করিয়ে দেন কোম্পানির প্রতিনিধি Sir Thomas Metcalfe'র সাথে।

জামাই শ্বশুর মিলে এই বিয়ের প্রায় তিন মাস আগেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে গোপনে এক চুক্তি করেন, চুক্তি অনুযায়ী মির্জা ফখরু তার বাবা নবাব বাহাদুর শাহ জাফরের বিরুদ্ধে এক প্রাসাদ ক্যু করে লালকেল্লা হতে সরে গিয়ে নিজেকে নবাব ঘোষণা করবেন, বিনিময়ে কোম্পানি বাহাদুর শাহ জাফরের পরিবর্তে তার বিদ্রোহী পুত্রকে নবাব হিসেবে স্বীকৃতি দেবে।

এর পরের ইতিহাস বড়ই নির্মম, ১৮৫৭ এর সিপাহি বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পেছনে অনেকগুলো কারণের মধ্যে অন্যতম একটা কারণ ছিল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের নিজ সন্তান কর্তৃক বিশ্বাসঘাতকতা।

এই বিশ্বাসঘাতক সন্তানের সাথে ইংরেজ কোম্পানি চুক্তি করেছিল বটে, কিন্তু ব্যর্থ বিদ্রোহের পরে হুমায়ুনের সমাধি সৌধে আত্মগোপন করা নবাবকে ২০ শে সেপ্টেম্বর যখন ধরে আনা হয়, তখন তার সাথে সেই বিশ্বাসঘাতক পুত্রও ছিল। আর পরদিন ২১ শে সেপ্টেম্বর কর্নেল হডসন নবাবের সামনেই সবার আগে এই বিশ্বাসঘাতক সন্তানকে গুলি করে হত্যা করে এ কথা প্রমাণ করে যে, বিশ্বাসঘাতককে কেউই বিশ্বাস করে না, এমনকি তার প্রভু, যাদের জন্য সে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তারাও না। রানী জিনাত মহল যে সন্তানকে নবাব বানানোর জন্য এত ষড়যন্ত্র করলেন সেই

www.pathagar.com

মির্জা জওয়ান বখতকেও বাবার সামনেই ফাঁসিতে ঝুলানো হয়!
আরও একটা ঘটনা, সেই ১৪৯১ খ্রিষ্টাব্দে গ্রানাডার সুলতান মুলয় হাসান যখন ফার্ডিনান্ডের সাথে যুদ্ধরত, তখন তার প্রথম স্ত্রীর ঘরের সন্তান আবু আব্দুল্লাহও পিতার সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। এক যুদ্ধে আবু আব্দুল্লাহ ফার্ডিনান্ডের খ্রিষ্টান বাহিনীর হাতে ধরা পড়লে সেখানে তিনি গোপন চুক্তির মাধ্যমে নিজের মুক্তি নিশ্চিত করেন। চুক্তি অনুযায়ী, ফার্ডিনান্ড আবু আব্দুল্লাহকে মুক্তি দেবে, আবু আব্দুল্লাহ ফিরে গিয়ে গ্রানাডায় নিজ পিতা সুলতান মুলয় হাসানের সাথে যোগ দেবে এবং সেখান থেকে তার পিতা ফার্ডিনান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য কখন কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন, সে তথ্য খ্রিষ্টান বাহিনীকে জানিয়ে দেবে!
নিজ পিতা ও নিজ জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে সাময়িক মুক্তি নিশ্চিত করতে পারলেও আবু আব্দুল্লাহকে কিন্তু অচিরেই তার মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছে! ১৪৯২ সালের ২রা জানুয়ারি গ্রানাডার পতনের পরে আবু আব্দুল্লাহকে তার খ্রিষ্টান প্রভু ফার্ডিনান্ড দেশ ছাড়া করেছে। আল হামরা ছেড়ে আসার সময় আবু আব্দুল্লাহ পেছন ফিরে প্রাসাদের দিকে চেয়ে যখন কাঁদছিলেন, তার বৃদ্ধ মা আয়েশা তখন ছেলের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন; 'পুরুষের মত যে রাজ্য রক্ষা করতে পারোনি, নারীর মত আজ সেই রাজ্যের জন্য অশ্রু ঝরাচ্ছো!' এটাই নিয়তি। বিশ্বাসঘাতকদের নিয়তি।
ইতিহাসের করুণ এ ঘটনাগুলো বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো, আমরা যেন ভুলে না যাই যে, সংসারে সকল সদস্যদের প্রতি ইনসাফপূর্ণ আচরণ করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যদি সাম্য, সুবিচার, সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা না থাকে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক যদি ইনসাফ ও আদেলের উপরে প্রতিষ্ঠিত না থাকে, তবে সে পরিবারের ধ্বংস অনিবার্য। এ বাস্তব সত্যটা কেবলমাত্র পরিবারের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয় বরং তা রাষ্ট্র ও সমাজের বেলাতেও সমানভাবে প্রযোজ্য।
অতএব, নিজ নিজ পরিবারে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করুন। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করুন, নিরাপদ থাকবেন ইনশাআল্লাহ।

www.pathagar.com

জব চার্নক, মানবিক শিক্ষা ও আমাদের ধর্মবোধ-

জব চার্নক, নামটা কি চেনা চেনা লাগছে? মনে করে দেখুন, ঠিকই চিনতে পারবেন। হ্যাঁ, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সামান্য চাকুরে, সামান্য কর্মচারী, লন্ডনে ১৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে চরম এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেয়া জব চার্নকের কথাই বলছি। সেই যে জব চার্নক, আমরা যাকে চিনি কাদা মাটি জলাশয়পূর্ণ এক জেলেপল্লী সুতানুটিকে গড়ে তুলেছিলেন চোখ ধাঁধানো কোলকাতা হিসেবে।

হ্যাঁ, পুরো বাংলাই কেবল নয়, বরং পুরো ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সূর্যটাকে কলংকের আবর্তে ডুবিয়ে দেয়ার কলকাঠি নাড়া হয়েছে যে কোলকাতায় বসে, সেই কোলকাতার কথাই বলছি। সেই কোলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্নক। জন্মের পরে চরম দরিদ্রতার নিষ্পেষণে জর্জরিত বাবা-মা'র বখে যাওয়া সন্তান কাজের জন্য নাম লিখিয়েছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির খাতায়। ভাগ্যগুণে চাকরিটা হয়ে গেলে পূর্ণ যৌবনে ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দের কোনো একটা দিনে এসে যোগ দেন কোম্পানির হুগলীর কাশিমবাজারস্থ কুঠিতে, একজন কর্মচারী হিসেবে।

সময়কালটা একটু খেয়াল করেছেন? সেটা ছিল ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দ, পলাশীর প্রান্তরে স্বাধীনতা হারানোর ঠিক এক শত বৎসর আগেকার ঘটনা। সম্রাট আওরঙ্গজেব তখন ক্ষমতায়। কোনো রকম কর প্রদান না করেই যথেচ্ছারের সাথে বাংলার আনাচে কানাচে ব্যবসা করে যাওয়ার ঘটনা নিয়ে মোগল সম্রাটের সাথে কোম্পানির যে সংঘাত এবং তারই ধারাবাহিকতায় সংঘাতের বিস্তৃতি আর শেষ পর্যন্ত ঠিক একশত বৎসর পরে এসে স্বাধীনতা হারানোর যে লম্বা ইতিহাস, তা বর্ণনা করার জন্য এ লেখার অবতারণা করিনি। ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে যে শিক্ষাটা আমাদের নজরে পড়েনি, যে শিক্ষাটাকে আমরা আত্মস্থ করে উঠিনি আজও, সেটাকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার জন্যই আজকের এই লেখা। তবে তার আগে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে জব চার্নকের ব্যক্তিগত জীবনে।

জব চার্নক ইংল্যান্ড থেকে ভারতে এসে আর ইংল্যান্ডে ফেরত যাননি। শতাব্দীর শেষের দিকে ১৬৯৩ সালে এক শীতের সকালে তিনি কোলকাতাতেই মারা যান। তিনি একবার কুঠির অনতিদূরে নদীর ধার ঘেঁষে কয়েকজন ইংরেজ সৈন্যসহ যাচ্ছিলেন। যাত্রাপথে দেখলেন নদীর ধারে অনেক নারী-পুরুষের জটলা, কেউ কেউ আবার চিৎকার করে কাঁদছে। নিকটে গিয়ে জানতে পারলেন, এক বনেদি হিন্দু ব্রাহ্মণ যুবকের মৃত্যু

www.pathagar.com

হয়েছে হঠাৎ করেই, তারই লাশ পোড়ানো হবে, তাই চিতা সাজানো হচ্ছে। মৃত উক্ত যুবকের বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন এক পাশে জটলা করে কাঁদছে। আর ঠিক তার একটু দূরেই আরও একদল নারী-পুরুষ বিলাপ করে কাঁদছে পনেরো বৎসরের অনিন্দ সুন্দরী এক কিশোরীকে ঘিরে ধরে।

চার্নক খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, এই কিশোরী মেয়েটি উক্ত মৃত যুবকের সদ্য বিধবা স্ত্রী, তাকেও আনা হয়েছে মৃত স্বামীর সাথে চিতায় জ্যান্ত পোড়ানোর জন্য। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েটি সবার চোখের সামনে, এমনকি, তার বাবা-মা, ভাই-বোনের চোখের সামনে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে! সেই কষ্ট আর বেদনায় মেয়েটির বাবা-মা ভাই বোন, আত্মীয়-স্বজনরা বিলাপ করছে। তবে যে মেয়েটি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুনে পুড়ে করুণভাবে মরতে যাচ্ছে, তার মধ্যে কিন্তু তেমন কোনো ভাবান্তর নেই! সে নিশ্চুপ পাথরের মত বসে আছে। আসলে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখানোর মত মানসিক অবস্থাতে সে ছিল না, সে ছিল একটা ঘোরের মধ্যে, কারণ, প্রথা অনুযায়ী তাকে ধুতুরা রস পান করানো হয়েছে, তারই ক্রিয়া ইতোমধ্যেই দেখা দিতে শুরু করেছে মেয়েটার মধ্যে।

চার্নক একটাবারের জন্য অসহায় মেয়েটার দিকে তাকালেন, কিন্তু তিনি আর চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলেন না। পাটনার রাজপুত বংশোদ্ভূত পনেরো বৎসরের কিশোরী এতটাই সুন্দরী ও নিষ্পাপ চেহারার ছিল যে, তার দিক থেকে চোখ ফেরানোটা অসম্ভব হয়ে পড়লো। এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন তিনি, তারপরে সৈন্যদের হুকুম করলেন, মেয়েটাকে ঘিরে ফেলতে, এগিয়ে গিয়ে সমবেত জনতার মধ্যে নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে বললেন, তোমরা এই নিষ্পাপ মেয়েটাকে হত্যা করো না, আমি তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিচ্ছি। 'রাম! রাম! ব্যাটা বলে কি? বামুনের জাত মারবে দেখছি!' বলে খেঁকিয়ে উঠলো সকলে।

কিশোরীকে এক প্রকার জোর করেই নিয়ে গেলেন নিজের কুঠিরে, সেটা ছিল সেই ১৬৬৩ সালের এক বর্ষণমুখর বিকেলের ঘটনা। এর পরে আজীবন তিনি মেয়েটাকে নিজের কাছে রেখেছেন, খ্রিষ্টধর্ম মতে বিয়ে করে স্ত্রী বানিয়ে, নাম রেখেছিলেন; মারিয়া। প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছেন। তাদের চার সন্তান হয়েছিল; এক ছেলে ও তিন মেয়ে। ছেলেটা চার্নকের জীবদ্দশাতেই মারা যায়। আর তিন মেয়ে; মেরি, এলিজাবেথ ও ক্যাথরিন, সকলে পূর্ণ বয়স পেয়েছিল। এক মেয়ে, সম্ভবত মেজো মেয়ে তো প্রায় শতবর্ষী হয়েছিল। প্রত্যেকেই খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী হয়ে ইংরেজ স্বামীকে বিয়ে করে ঘর সংসার করেছিল।

www.pathagar.com

যা হোক, দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর একত্রে ঘর সংসার করার পর মারিয়া ১৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দে মারা যায়, ১৬৯২ খ্রিষ্টাব্দে চার্নকের মৃত্যুর প্রায় পাঁচ বৎসর আগেই। স্ত্রী মারিয়াকে কোলকাতা বারাকপুরে খ্রিষ্টধর্ম মতে কবরস্থ করা হয়। চার্নক স্ত্রীর কবরের পাশেই একটা বাগানবাড়ি করেছিলেন। প্রতি বৎসর তার মৃত্যুদিবসটাকে পালন করে গেছেন আমৃত্যু। এ ঘটনা নিয়ে রোমান্টিক প্রেমের উপন্যাস রচনার জন্য এ লেখা নয়। আমি বরং ঘটনার পেছনে ভিন্ন একটা বিষয়কে আপনাদের সামনে আনতে চাই বিবেচনার জন্য।

হিন্দু সমাজে স্ত্রীর জীবদ্দশায় স্বামীর মৃত্যু হলে সেই বিধবা স্ত্রীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব তার কোনো আত্মীয় স্বজনই নিতো না, এমনকি, নিজ গর্ভে ধারণ করা ছেলে-মেয়েও নয়। রাষ্ট্র বা সমাজ কেউই এমন নারীর কোনো দায়িত্ব নিতো না বলে তাদেরকে মৃত স্বামীর সাথে একই চিতায় পুড়িয়ে মারা হতো। আর জঘন্য, অমানবিক এ প্রথাটিকে ধর্মীয় রং দিয়ে মহিমান্বিত করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে স্বামীর লাশের সঙ্গে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে আত্মাহুতি দেয়া স্ত্রী হতভাগিনীকে 'সতী' হিসেবে বিরোচিত, মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত করা হতো। স্বামীর আগে স্ত্রী মারা গেলে কিন্তু সেই স্ত্রীর লাশের সাথে স্বামীকে মরতে হতো না, এ ক্ষেত্রে স্বামী ছিল অত্যন্ত সৌভাগ্যবান!

সে যা হোক, ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায় খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে এই ঘৃণ্য বর্বর প্রথা চলে আসছে চটকদার 'সতীদাহ' নামে। আরবেও জীবন্ত কন্যা শিশুকে মাটিতে পুঁতে ফেলা হতো। প্রিয় রাসূল (সা:) এসে এর বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ে তুললেন। আর যখন রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পেলেন, চিরদিনের জন্য এ প্রথাকে অবৈধ ঘোষণা করলেন (স্বয়ং আল্লাহই তা অবৈধ ঘোষণা করলেন), সমাজ থেকে বর্বর অমানবিক এ রীতিটি দূর হয়ে গেল।

সেই প্রিয় রাসূল (সা:)-এর অনুসারী মুসলমানরা ভারতের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে এ সমাজ থেকে অমানবিক এ প্রথাটি দূর করার জন্য কোন পদক্ষেপটি নিয়েছে? এটা কি তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়েনি? জনসচেতনতা সৃষ্টির কি কোনো পদক্ষেপ তারা নিয়েছিল? ষোড়শী পাঁচ হাজার সুন্দরীকে নিজ হেরেমে রক্ষিতা করে ভোগের সামগ্রী বানবার জো ছিল কিন্তু এইসব হতভাগীদের পুনর্বাসনের কি কোনো উপায় সেইসব মহামতিদের জানা ছিল না? জব চার্নক আসা ও তার মৃত্যুর পরে ১৮২৪ থেকে ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দ, এই দশ বৎসর সময়কালে ৫৯৯৭ জন নারীকে পুড়ে মরতে হয় বাংলা বিহার

www.pathagar.com

উড়িষ্যায়, প্রতি বৎসর গড়ে ৬০০ জন! ভারত বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক কর্তৃক দাখিলকৃত বাৎসরিক প্রতিবেদনে দেখায় যায়, ১৮২৯ সালে, একটি মাত্র বৎসরে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় ৪৬৩ জন নারীকে পুড়তে হয়েছে চিতায়, এর মধ্যে একমাত্র বাংলাতেই ৪২০ জন!

মোগল সম্রাট, আমাদের শাহানশাহ, বাদশাহ আলামপনাহরা কোনো ব্যবস্থা নেননি ধর্মের নামে পুরুষ ও ক্ষমতাবানদের হাতে অসহায় নারীর জীবন বাঁচাতে। কিন্তু সুদূর ইংল্যান্ড থেকে আগত এক ইংরেজ তার নিজে চেষ্টায় একজন নারীকে যে কেবল বাঁচিয়েছেন তাই নয়, তিনি তাকে সারা জীবনের জন্য নারীত্বের, মাতৃত্বের সামাজিক ও মানবিক মর্যাদাও দিয়েছেন!

জব চার্নক ছিলেন অত্যন্ত ক্রূর, নির্মম, শঠ প্রকৃতির লোক। তার সহকর্মী ও সমসাময়িক ইংরেজ পর্যটক Alexander Hamilton-এর বর্ণনা এবং কোম্পানির বাৎসরিক গোপন প্রতিবেদনেও সে কথার প্রমাণ রয়েছে লিখিত আকারে।

সেই অশিক্ষিত, নির্মম, লোভী, শঠ লোকটিই যখন আল্লাহর সৃষ্টির মানবিক কল্যাণে এগিয়ে এলেন আমাদের বড় বড় আল্লামাদের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে, তখন ইতিহাসের গতিপথ উল্টে যাওয়ার সূচনা হলো। আল্লাহর নিয়ম হলো সমাজ ও সভ্যতার নেতৃত্ব থাকবে তাদের হাতে যাদের দ্বারা সমাজবাসীর বৈষয়িক, জৈবিক ও মানবিক প্রয়োজন পূরণ হয়।

এ ক্ষেত্রে তার কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। নিজেদের চোখের সামনে একজন নারীকে নিশ্চিত পৈশাচিক মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে সম্মানের সাথে বাঁচা ও পুনর্বাসনের জাজ্বল্যমান উদাহরণ তৈরি হওয়ার একশতটি বৎসর পরেও মুসলিম নামধারী শাসক ও সমাজের বোধোদয় না হওয়ার কারণে আল্লাহপাক এই এদের হাতেই ক্ষমতা তুলে দিলেন পুরো ভারতের!

ধর্মের কল্যাণ (!) করতে ব্যস্ত মহাধার্মিকগণ যতক্ষণ না এটা বুঝছেন যে, আমরা আসলে ধর্মের কোনো কল্যাণ করতে পারি না, ধর্মই মানুষের, এর অনুসারী ধার্মিকদের কল্যাণটাকে নিশ্চিত করে। আমাদের দায়িত্ব হলো, ধর্মের নয়, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষ প্রতিটি মানুষের, প্রতিটি প্রাণীর কল্যাণটা নিশ্চিত করা। এটাই হলো ধর্মের, ইসলামের মৌলিক শিক্ষা। যে বা যারা এই মৌলিক শিক্ষাটাকে আত্মস্থ করেছে বা করতে পেরেছে, এই সমাজ, এ বিশ্বের নেতৃত্ব আর সম্মান তাদের হাতেই থাকবে, নিষ্ক্রিয় বসে থেকে মুখের বাগাড়াম্বরে মাঠ গরম করা সাধু কিংবা স্বঘোষিত আল্লামাদের হাতে নয়।

www.pathagar.com

কুরআন যদি ফ্রান্সের চেয়েও শক্তিশালী হয়, তো, আমি কি করতে পারি?

ফ্রান্স ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে এক তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুসলিম দেশ আলজেরিয়ায় সামরিক আগ্রাসন চালায় এবং দেশটি দখল করে নেয়। শুরু হয় একশত তিরিশ বৎসরের দখল দায়িত্ব। আর সেই থেকে আলজেরিয়া ক্রমাগত ভাবে বৎসরের পর বৎসর ধরে ১৯৬২/৬৩ সাল পর্যন্ত ফরাসি নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হতে থাকে।

বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর, প্রগতিশীল, মুক্তচিন্তা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রবক্তা বলে পরিচিত ফ্রান্স পুরো একটি শতাব্দীর ও বেশি সময় ধরে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও আধুনিকায়নের নামে যে ঘৃণ্য বর্বরতা, পৈশাচিক নৃশংসতা, নির্যাতন, ধ্বংষযজ্ঞ ও হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে তা মানবিতিহাসে খুব একটা দেখা যায় না।

আফসোস, সেই বর্বরতা, সেই হত্যাযজ্ঞ আর নৃশংসতাকে না আঁকা হয়েছে কোন লেখকের লেখাতে, আর না তুলে ধরা হয়েছে কোন নির্মাতার সে লুলয়েডের ফিতায়। মুসলিম বাবা-মা'র সন্তানদের যে অংশটি চলচিত্র নির্মাতা হয়েছেন তারা ব্যস্ত ছিলেন হলিউডের অনুকরণে অশ্লীল রোমান্টিক প্রেমের ছবি নির্মাণে, যে সব লেখক তৈরি হয়েছিলেন তারা লিখেছেন প্রেমের গল্প কেবল, জীবন ও সমাজের করুণ গাঁথা লেখার সময় তাদের হয়নি।

আগ্রাসী শক্তি ফ্রান্সের দ্বারা দেশ আক্রান্ত হবার পরে স্বভাবতই আলজেরিয় মুসলমানরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। লজ্জা আর অনুশোচনার কারণ হলো, ধর্ম প্রাণ মুসলমানরা ওসমানীয় খেলাফতের গভর্নরের নেতৃত্বে যখন ফরাসি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে ব্যস্ত, ঠিক তখন সে কুল্যার, আরব জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারনায় উজ্জীবিত "মাখজেন' গোত্র আগ্রাসী ফরাসি শক্তির সাথে সহযোগিতায় নামে, নিজ দেশ আলজেরিয়াকে 'বর্বর তুর্কি' মুক্ত করে একটি' আধুনিক আলজেরিয়া' গড়ার মানসে।

আহা, রাজনীতির কি কারিশমা, আধুনিকতার কি মোজেযা! জাতীয়তাবাদী চেতনার কি বাহারি উন্মাদনা!! রাজনীতির সেই কারিশমা বুঝতে, আধুনিকতার সেই মোজেজা দেখতে আর জাতীয়তাবাদী উন্মাদনার স্বরুপ দেখতে আলেজেরিয়াকে প্রায় পাঁচলক্ষ প্রাণের নজরানা পেশ করতে হয়েছে। কেবলই কি তাই? ঐ অর্ধ মিলিয়ন বা পাঁচ লক্ষাধিক প্রাণের বাইরেও এক বিশাল বর্ণনাতীত মূল্য দিতে হয়েছে আলজেরিয়বাসীকে।

www.pathagar.com

আজ আলজেরিয়ার দ্বিতীয় প্রধান ভাষা, অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে, সরকারি অফিস আদালতে, বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ইউনিভার্সিটিতে আরবির পাশাপাশি ফ্রেঞ্চ-ই হলো প্রধান ভাষা।

আধুনিক আলজেরিয়া গড়তে হলে সেখান থেকে পশ্চাৎ পর, সে কেলে ধ্যান ধারনা হটিয়ে বিদেয় করতে হবে। আর ইসলামের মত এত সেকেলে, এত পশ্চাৎ পর দর্শন এ বিশ্বের আর কি হতে পারে? অতএব,আলজেরিয়া থেকে ইসলাম দূর করো।

আলজেরিয়ায় নারী মুক্তির নামে নারীকে তার সম্মানজনক আসন হতে বের করে এনে অশ্লীলতা আর বেহায়াপনার ঠিকাদার বানিয়ে রাস্তায় নামা ও পুরুষের সাথে অসম ও বৈরি প্রতিযোগিতায়; সম অধিকার আদায় করো।

ইসলামের বুনিয়াদি দূর্গ; ঘরকে অরক্ষিত রেখে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দক্ষ ও সুনাগরিক হিসেবে তৈরি করার মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে নারীকে কৌশলে বের করে এনে ইসলামি সমাজ, তথা বৃহত্তর মানব সমাজের সুষ্ঠূ বিকাশের ধারা বন্ধ করে পথে নামো! স্বাধীনতা ও আধুনিকতার নামে ভোগবাদীতার সয়লাবে নিজেকে ভাঁসিয়ে দাও অসুস্থ এক উন্মাদনায়!

ইসলামি শিক্ষা কার্যক্রমের সকল আয়োজনকে সংকুচিত করে এনে সেখানে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা চালুর নামে ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হলো (প্রকৃতপক্ষে তা হলো খৃষ্টধর্ম অথবা সেকুল্যার পন্থী শিক্ষাব্যবস্থা, যার মূল বক্তব্যই হলো; ইসলাম বিরোধি হয়ে বেড়ে ওঠা বা ইসলামের বিরোধিতা করা)।

ইসলাম মেনে চলাকে কঠিন করে তোলা হয়। ক্রমাগত অপপ্রচার চালিয়ে ইসলামের অনুশাসন যারা মেনে চলে, তাদেরকে দেশ ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর, পশ্চাৎপর, প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। হাজার হাজার আলেমকে দেশ ও সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার নামে হত্যা করা হয়। তাদের দ্বারা পরিচালিত মসজিদ ও মাদ্রাসাকে বন্ধ করে দেয়া হয়। লক্ষ লক্ষ মুসলমানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়া হয়।

আর এরই পাশাপাশি জোরদার করা হয় খৃষ্টধর্ম প্রচারের কার্যক্রম। প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে সরকারি পৃষ্ঠ পোষকতা প্রদানের মাধ্যমে খৃষ্টধর্ম প্রচারে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গকে উৎসাহিত করা হয়, তাদের সহযোগীতা প্রদান করা হয় রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে নানা কৌশলে।

আলজিয়ার্স সহ দেশের বড় বড় শহরগুলোতে খোলা হয় মিশনারী স্কুল, হাসপাতাল আর গির্জা। প্যারিস থেকে বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষিত আরবি জানা

www.pathagar.com

পাদ্রিরা গিয়ে ভীড় করতে লাগলেন পুরো আলজেরিয়ার আনাচে কানাচে, খৃষ্টবাদ প্রচারের জন্য। আরবি ভাষায় খৃষ্টের বাণী ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আলজেরিয়ার মুসলমানদের মধ্যে।

বিনোদনের নামে প্রতিষ্ঠা করা হয় সিনেমা হল, দিনে তিন তিনটি শো'তে চালানো হতো ফরাসি চলচিত্র, যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ই হলো যৌনতা ও অশ্লীলতা। সারা দেশ জুড়ে খোলা হয় অসংখ্য পানশালা; পাব। মদের ছড়াছড়ি!

এর সাথে অনিবার্য ভাবে এসে পড়ে ক্লাব গুলোর কথা। প্রত্যেকটি শহরে গড়ে উঠে ক্লাব, বিনোদনের নামে রাত ভর নারী-পুরুষের অবাধে মেলামেশা, আড়ালে আবডালে হাতে কলমে 'আধুনিক' হবার প্রশিক্ষণ চলে অবারিত ভাবে!

আলজেরিয়ার ফরাসি প্রশাসন নিজেদের খরচে ভর্তুকি দিয়ে শত শত পত্রিকা, ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে লাগলো। শত শত বইপত্র রচনা ও প্রকাশ করা হলো মুক্ত চিন্তার নামে নাস্তিক্যবাদ, সেকুল্যারিজমের নামে ইসলাম বিদ্বেষ অথবা নিদেন পক্ষে ইসলামি বিধি বিধান ও দর্শনের প্রতি সন্দিহান একটা প্রজন্ম তৈরি করার জন্য।

এভাবেই সরাসরি ফরাসি সরকার ও সমাজের প্রত্যক্ষ কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে মুসলিম আলজেরিয়ায় গড়ে উঠে একটা সুশীল সমাজ, রক্ত মাংশে ফরাসি হলেও বোধ-বিশ্বাসে সেকুল্যার। আর এক অর্থে, কট্টর মুসলিম বিদ্বেষী প্রজন্ম, খোদ মুসলিম বাবা-মা'র গর্ভে!

ফরাসি সরকারের চিন্তাই ছিল কিভাবে আরও দ্রুত আলজেরিয় সমাজ থেকে ইসলামকে দূর করা যায়। সে লক্ষ্যে গৃহিত এত সব পদক্ষেপের পরেও ফরাসি সরকারের আলজেরিয় বিষয়ক দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রীর ঘুম হারাম হবার জোগাড়। অনেক ভাবনা চিন্তার পরে তিনি আলজেরিয়া থেকে কয়েক ডজন মুসলিম ছাত্রীকে ফরাসি সরকারের বিশেষ বৃত্তি প্রদান করে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্যারিসে এনে বিভিন্ন স্কুল কলেজে ভর্তি করিয়ে দিলেন।

মুসলিম এসব মেয়েরা ফরাসি ছাত্রীদের সাথে একই হোস্টেলে, একই সমাজে, একই পরিবেশে থেকে লেখাপড়া করে বৎসরের পর বৎসর। গ্রীষ্মের ছুটিতে মাস দেড়েকের জন্য এই সব ছাত্রীরা আলজেরিয়ায় তাদের বাবা-মা'র কাছে যাবার সুযোগ পেতো। এভাবে তারা এক নাগাড়ে তের বৎসর প্যারিসে সেকুল্যার পরিবেশে থেকে গ্রাজুয়েশন শেষ করে।

শিক্ষাবর্ষ শেষে এইসব ছাত্রীদের আনুষ্ঠানিক ভাবে সনদ প্রদানের আয়োজন করা হলো। উক্ত অনুষ্ঠান প্যারিসের সুশীল সমাজের অনেক গণ্যমান্য

www.pathagar.com

ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ, প্রেস, সাংবাদিক, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বৃন্দসহ অনেক নারী পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। গোল বাঁধলো অনুষ্ঠান স্থলে যখন আলজেরিয় মুসলমান ছাত্রীরা দল বেঁধে উপস্থিত হলো, তখন। সকলে অবাক বিস্ময়ে, একরাশ হতাশা মাখা দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ্য করলো প্রতিটি আলজেরিয় ছাত্রীই পরিপূর্ণ ইসলামি পোশাক ও হিজাব পরেই অনুষ্ঠান স্থলে এসে হাজির!

দীর্ঘ তের বৎসর প্যারিসে ফরাসি খৃষ্টান মেয়েদের সাথে থেকে পড়াশুনা ও বসবাস করেছে তারা। স্কুল-কলেজ শিক্ষকদের সুপরিকল্পিত ও সযত্ন প্রয়াস সত্ত্বেও এসব মেয়েরা কেউই ইসলামি সংস্কৃতি ও পোশাক ছেড়ে খৃষ্টবাদী ফরাসি, তথাকথিত আধুনিক সংস্কৃতি ধারন করেনি!

এ অবস্থা দেখে ভেতরে ভেতরে চরম অসন্তুষ্ঠ ফরাসি সুশীল সমাজ মন্ত্রীর কাছে এর কারণ জানতে চাইলে মন্ত্রী এক চমৎকার জবাব দিয়েছিলেন, বলেছিলেন; আমার কি দোষ? মুসলমানদের কুরআন পুরো ফ্রান্সের সকল সম্পদ ও শক্তির চেয়েও শক্তিশালী হলে আমি কি করবো?

আপনি কি বর্তমান বিশ্ব সমাজের শক্তিমত্তা দেখে আতংকিত? বিশ্বাস করুন, আল কুরআনের যে শিক্ষা, সেই শিক্ষার শক্তি সমস্ত বিশ্বের এই শক্তির চেয়েও শত গুণ বেশি শক্তিশালী। ইচ্ছা করলেই আপনি সে শিক্ষাকে নিজের ভেতরে ধারণ করে আধুনিক বিশ্বের সকল বৈরিতার বিপরিতে অজেয় হয়ে উঠতে পারেন। আল কুরআন তো সামনেই রয়েছে; চয়েস ইজ ইউরস্।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com